ঋ ণ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নব সাহিত্য প্রকাশনী
১২৮/১ এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক
শ্রীমতী চন্দনা ঘোষ
১২৮/১এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক
অধীর রঞ্জন ঘোষ
১০৯বি, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
রবীন দত্ত

রা-স্বা

শ্রীঅশোক চক্রবর্তী
পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার নাম ?

মিঠু মিত্র।

বাবার নাম ?

স্বর্গত পিনাকী মিত্র।

আপনার কোনও পোশাকি নাম আছে ?

না, আমার একটাই নাম।

বয়স ?

তেত্রিশ বছর।

ঠিকানা ?

এই ফ্ল্যাটই আমার ঠিকানা।

এই ফ্ল্যাট ছাড়া আপনার আর কোনও বাড়ি নেই ?

আছে। কৃষ্ণনগরে। আমার বাবা করেছিলেন। কিন্তু সেটা ভাড়াটেদের দখলে। তারা ভাড়াও দেয় না।

বাড়ির ট্যাক্স কে দেয় ?

আমিই দিই।

আপনি কোথায় চাকরি করেন ?

এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে।

ব্রাঞ্চ ?

রসা রোড।

কী চাকরি করেন ?

অ্যাকাউন্টস অফিসার।

কতদিন চাকরি করছেন ?

প্রায় দশ বছর।

একই ব্রাঞ্চে ?

না। তিনটে ব্রাঞ্চে ঘুরে ফিরে।

আপনার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ?

সিঙ্গল।
কখনও বিয়ে হয়েছিল ?
হয়েছিল।
কার সঙ্গে ?
মিতালি ঘোষ। ডিভোর্স হয়ে গেছে।
বিয়েটা ভেঙে গেল কেন ?
মিতালি আমাকে পছন্দ করত না।
কেন করতেন না ?
সেটা তারই জানার কথা।
অপছন্দের কথাটা তিনি কবে প্রকাশ করেন ?
বিয়ের রাতেই।
অপছন্দ হলে তিনি আপনাকে বিয়ে করলেন কেন ?
আমাদের বিয়েটা কিছুটা অ্যাকসিডেন্টাল।
কী রকম ?

ওর বাবা বরুণ ঘোষের লাং ক্যান্সার হয়েছে বলে একজন বড় ডাক্তার সন্দেহ প্রকাশ করেন। মিতালি তাঁর একমাত্র সন্তান, তিনি বিপত্নীক ছিলেন। সুতরাং তিনি খুব তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। হাতের কাছে আমাকে পেয়ে আমার সঙ্গেই বিয়ে দেন।

বরুণ ঘোষের সঙ্গে আপনার বিয়ের আগে পরিচয় ছিল ?

সামান্য ছিল। আমার ব্রাঞ্চে ওঁর অ্যাকাউন্ট ছিল। প্রায়ই আসতেন। আমি তখন ক্যাশে বসতাম। সেই সূত্রেই পরিচয়।

মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পক্ষে পরিচয়টা যথেষ্ট নয় কিন্তু।

সেটা আমি অস্বীকার করছি না।

বরুণ ঘোষ কি নিজেই আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

আপনিও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান ?

না। আমার বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। উনি ওঁর অসুখের কথা বলে আমাকে রাজি করান।

কিন্তু আমরা যতদূর জানি বরুণ ঘোষের ক্যান্সার হয়নি।

না। সেটা পরে ধরা পড়ে। কিন্তু তখন ক্যান্সার হয়েছে বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

দেখুন, আমরা পুলিশের লোক। সহজ সরলভাবে কোনও কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের কাছে খবর আছে, বিয়ের ব্যাপারে আপনারই আগ্রহ ছিল বেশি। কারণ বরুণ ঘোষের টাকা এবং বিষয়সম্পত্তি। তাঁর মেয়ে মিতালিও ছিল সুন্দরী এবং মেধাবী। আপনার যা স্ট্যাটাস তাতে বরুণ ঘোষের মতো একজন ধনী লোক তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে আপনার সঙ্গে দিতে চাইবেন এবং তার জন্য চাপাচাপি করবেন এটা কি স্বাভাবিক ঘটনা?

না, স্বাভাবিক ঘটনা নয়, আমিও জানি। কিন্তু তখন সিচুয়েশনটাও স্বাভাবিক ছিল না। উনি নাচার হয়েই বিয়েটা দেন।

আমি যদি বলি, আপনি ওঁর মেধাবী ও সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করে ওঁর বিরাট সম্পত্তি গাপ করার জন্য ওঁকে ব্ল্যাকমেল করেছিলেন?

ব্ল্যাকমেল! কীভাবে ব্ল্যাকমেল করব?

সেটা আস্তে আস্তে জানা যাবে। তদন্তের তো মোটে শুরু।

আগেই বলেছি বরুণবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় গভীর ছিল না। ব্যাঙ্কের সূত্রে পরিচয়। তাঁকে ব্ল্যাকমেল করার প্রশ্নই ওঠে না।

এই বিয়েতে যে মিতালির আপত্তি ছিল, তা কি আপনি বিয়ের আগে জানতে পেরেছিলেন?

না।

মিথ্যে কথা। বিয়ের আগে মিতালিই আপনাকে টেলিফোন করে জানান যে, এই বিয়েতে তিনি রাজি নন।

না তো, এ রকম ঘটনা ঘটেনি।

শুধু তাই নয়, মিতালি আপনাকে একটা চিঠিও লিখেছিলেন।

আমি কোনও চিঠি পাইনি।

মিতালি ঘোষের বন্ধুরা কিন্তু সাক্ষী দেবে। তারা জানে।

আমি সত্যি কথাই বলছি।

ইউ আর এ কুল কাস্টমার। এই ফ্ল্যাটটা কার?

আমার।

এটা কি বিয়ের আগেই কিনেছিলেন?

হ্যাঁ।

ফ্ল্যাট কেনার টাকা কে দিয়েছিল?

ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে কিনেছিলাম। ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি ছিল।

মিথ্যে কথা। আমরা জানি, ফ্ল্যাট কেনার জন্য টাকা আপনি আদায় করেছিলেন বরুণ ঘোষের কাছ থেকে।

কিন্তু আমার লোনের রেকর্ড ব্যাঙ্কে আছে।

সে টাকা তুলে আপনি হয়তো ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছেন বা শেয়ারে খাটিয়েছেন। আমরা সবই জানতে পারব।

বরুণ ঘোষের কাছ থেকে আমি টাকা নিইনি।

বিয়ের রাতে মিতালি আপনাকে কী বলেছিলেন?

বলেছিল আমাকে তার পছন্দ নয়।

আপনি তখন কী করলেন?

আমি খুবই অসহায় ফিল করলাম। আমি তাকে বলেছিলাম যে, পছন্দ না হয়ে থাকলে আমার দিক থেকে তার কোনও ক্ষতি হবে না।

মিথ্যে কথা। আপনি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার সঙ্গে উপগত হয়েছিলেন।

না। কখনওই নয়। তার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্কই হয়নি।

আপনারা এই ফ্ল্যাটে কতদিন একসঙ্গে বসবাস করেছেন?

একসঙ্গে বসবাস করিনি। ফুলশয্যার রাত থেকেই মিতালি আর আমি আলাদা ঘরে শুতাম। মাসখানেক বাদে মিতালি স্থায়ীভাবে চলে যায়।

আপনার হাইট কত ?

পাঁচ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চি।

ওজন ?

আটাত্তর কেজি।

মিতালি দেবীর গয়নাগুলি আপনি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে রেখে দিয়েছিলেন কেন ?

গয়না। তার গয়নার খবরই আমি রাখি না।

আপনারা দুজন যুবক-যুবতী একসঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকতেন, তবু আপনাদের মধ্যে সেক্স রিলেশন হয়নি এটা কি আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন ?

বলি। কারণ ঘটনাটা সত্যি।

আপনার রান্নাবান্না কে করে ?

আমি নিজেই করি।

সব কিছু করেন ?

আমার কোনও কাজের লোক নেই। নিজেই সব করি।

তরকারি বা মাছ কুটতে পারেন ?

পারি।

তরকারি কী দিয়ে কাটেন ? বঁটি ?

না। ছুরি দিয়ে।

কী রকম ছুরি ?

কিচেন নাইফ।

দেখুন তো, এ রকম ছুরি ?

না না, অত বড় নয়।

এর চেয়ে কতটা ছোট হবে ?

আরও দু ইঞ্চি ছোট।

আপনি কি জানেন মিতালি দেবী ঠিক এরকমই একটা কিচেন নাইফে খুন হয়েছেন ?

জানি।

কীভাবে জানলেন ?

কাগজে পড়েছি। আপনি কী মিন করতে চাইছেন ?

আচ্ছা, মিতালি দেবী কি কখনও আপনাকে বলেছিলেন

যে, তিনি অন্য কাউকে ভালবাসেন ?

না তো !

ভাল করে ভেবে দেখুন।

এ রকম কথা বললে আমার মনে থাকত।

বিয়ের সময় আপনার বয়স কত ছিল ?

পঁচিশ-ছাব্বিশ।

আর মিতালি দেবীর ?

আঠারো-উনিশ। তখন ও ডাক্তারি পড়ছিল।

আপনার কি কোনও প্রেমিকা আছে ?

না।

মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স, নামমাত্র বিয়ে, তবু কেউ জোটেনি ?

না।

না ? অথচ এর আগে পুলিশের জেরার উত্তরে আপনি বলেছেন যে, আপনার দুজন বান্ধবী আছেন !

বান্ধবী আর প্রেমিকা এক নয়।

তফাতটা কী ?

অনেক তফাত।

তাদের মধ্যে একজনের নাম কি শিখা বরুয়া ?

হ্যাঁ।

আর একজনের নাম মন্দিরা সেন ?

হ্যাঁ।

এদের সঙ্গে আপনার কোনও অ্যাফেয়ার নেই ?

না।

বিশ্বাস করতে বলছেন ?

বলছি।

ঠিক আছে। ডিভোর্সের পরই আপনার স্ত্রী বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। ফর হায়ার স্টাডিজ। কোথায় গিয়েছিলেন আপনি জানেন ?

শুনেছি আমেরিকায়।

আপনি বিদেশে তাঁর ঠিকানা জানতেন ?

ন্‌না।

জানতেন না? তা হলে তাঁকে যে আপনি গাদা গাদা চিঠি লিখতেন সেগুলো তাঁর কাছে কীভাবে পৌঁছোত?

আমি তাকে চিঠি লিখতাম না।

হাসালেন মশাই। তাঁর সুটকেসে আপনার একাধিক চিঠি পাওয়া গেছে।

আমি তাকে চিঠি লিখিনি।

কখনও নয়?

না।

আচ্ছা, আপনার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

প্রথম দিকে ভালই ছিল। মিতালি আমাকে ছেড়ে ওঁর কাছে চলে যাওয়ায় উনি খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। মিটমাটের চেষ্টাও করেছিলেন। তখন আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতেন, দুঃখ প্রকাশ করতেন। মিতালি শেষ অবধি ডিভোর্সের মামলা করায় উনি ভেঙে পড়েন। শুনেছি তখন থেকেই ওঁর হার্টের দোষ দেখা দেয়। তখন থেকেই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ কমে যেতে থাকে।

আপনি কি বরুণ ঘোষকে সে সময়ে থ্রেট করেছিলেন?

না তো! থ্রেট করব কেন?

আপনি কি কুংফু ক্যারাটে জানেন?

খানিকটা শিখেছিলাম।

কেন শিখেছিলেন?

এমনি, শখ করে।

নাকি মস্তান হওয়ার জন্য!

মস্তান!

অবাক হচ্ছেন? বাসব হালদার নামে একজন লোককে তার দু'জন বন্ধুসহ আপনি একডালিয়ায় মারধর করেছিলেন। তারা আপনার বিরুদ্ধে পুলিশে ডায়েরি করেছিল। পুলিশ আপনাকে গ্রেফতারও করে। ঠিক কি না?

হ্যাঁ। বাসব হালদার নিজেই একজন গুণ্ডা।

একডালিয়ায় আমার একজন বন্ধু ভাড়া বাড়িতে থাকত। তাকে তুলে দেওয়ার জন্য বাড়িওলা বাসবকে লাগায়। বাসব তাকে প্রায়ই হ্যারাস করত, এমনকী তার বোনকে পর্যন্ত রাস্তায় ঘাটে টিজ করা শুরু করে। তখন বাধ্য হয়ে—

বাসব হালদার গুণ্ডা ছিল, এ কথা আপনিই বলছেন। তাহলে বলুন, গুণ্ডাকে পেটাতে পারে আরও একজন গুণ্ডাই, তাই না?

আমি গুণ্ডামি করিনি, অন্যায়ের প্রতিকার করেছিলাম মাত্র।

রবিন হুড? অ্যাঁ! আপনি নিজেকে হিরো বলে প্রমাণ করতে চাইছেন নাকি? তা হলে বলি, আপনার বিরুদ্ধে আরও একটা পুলিশ কেস ছিল। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে ন্যাটা দাসকে আপনি মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। বেচারা মারাও যেতে পারত। এফ আই আর-এ আছে আপনি তাকে গুলিও করেছিলেন।

আমি! আমি কী করে গুলি করব? আমার কোনও বন্দুক পিস্তল নেই।

ধীরে, মশাই, ধীরে। গুলি আপনি করেছিলেন ঠিকই, তবে শেষ অবধি সেটা প্রমাণ হয়নি। প্রমাণ হয়নি বলেই ধরে নেবেন না যে আপনি নিরপরাধ। অনেক ক্রাইমই প্রমাণ হয় না। ন্যাটা দাসকে আপনি কেন মেরেছিলেন?

আমার জ্যাঠামশাই তাকে বিশ্বাস করে কিছু ডলার ভাঙাতে দিয়েছিলেন। টাকাটা সে মেরে দেয়।

কীরকম জ্যাঠামশাই?

গ্রাম সম্পর্কের। ওঁকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। জাহাজে চাকরি করতেন।

ন্যাটা দাসও কি গুণ্ডা ছিল?

নিশ্চয়ই। পুলিশের রেকর্ডে তার বিরুদ্ধে অনেক কেস।

আপনি কি তাকে খুন করতে চেয়েছিলেন?

না। শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম।

খুনের একটা টেন্ডেন্সি আপনার কি বরাবর ছিল?

না।

তাহলে আপনি আসলে একজন হিরো? দুঃখের বিষয় এরকম একজন হিরোর মূল্য মিতালি দেবীই টের পেলেন না! যাকগে, বরুণ ঘোষের কথায় আসা যাক। আপনি তাঁকে কীভাবে ব্ল্যাকমেল করতেন বলুন তো!

ব্ল্যাকমেলের প্রশ্নই ওঠে না।

ওঠে। তার আগে জিজ্ঞেস করি, ব্ল্যাকমেল কথাটার অর্থ আপনি জানেন তো! গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা বা সুবিধা আদায়। আপনি বরুণ ঘোষের অন্তত একটা গুপ্ত খবর জানতেন।

কী?

ওঁর বেনাম্মা অ্যাকাউন্ট। রুদ্র সেন, পিনাকী শর্মা আর হরিপদ হাজরা— এই তিনটে ফিকটিশাস নামে ওঁর আরও তিনটে অ্যাকাউন্ট ওই ব্রাঞ্চে ছিল। আপনি কি তা জানতেন না?

জানতাম।

এটা কি গুপ্ত খবর নয়?

এটা ম্যালপ্র্যাকটিস। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য কেউ কেউ করে। কিন্তু তেমন মারাত্মক অপরাধ নয় বলে গুরুত্ব না দিলেও চলে।

তা হলে কি বলতে চান, আপনি বরুণ ঘোষ সম্পর্কে আরও গুরুতর কোনও গুপ্ত কথা জানতেন?

না। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় সামান্য।

আপনি কি জানেন আমরা তাঁর কিছু ডায়েরি পেয়েছি, যাতে তিনি লিখে গেছেন যে, তাঁকে কেউ নিয়মিত ব্ল্যাকমেল করত?

না। আমার এসব জানার কথা নয়।

যদি বলি ব্ল্যাকমেলার হিসেবে তিনি আপনার কথা ডায়েরিতে লিখে গেছেন?

হতেই পারে না। তিনি তেমন মিথ্যেবাদী ছিলেন না।

ইউ আর এ কুল কাস্টমার। জানেন তো, বড় ক্রিমিনালরা

খুব কুল হেডেড হয়? যাকগে, ডায়েরি তো কোর্টেই প্রোডিউস করা হবে। বরুণবাবুর কাছ থেকে পণ হিসেবে আপনি কত টাকা নিয়েছিলেন?

এক পয়সাও নয়।

আচ্ছা, এবার বেশ ভেবে বলুন তো, বিয়ের রাতে মিতালি দেবী ঠিক কী ভাষায় বলেছিলেন যে তিনি আপনাকে পছন্দ করেন না। ভেবে বলুন।

খুব সাধারণভাবে বলেছিল।

বিয়ের রাতে না ফুলশয্যার রাতে?

ফুলশয্যার রাতে।

কী বলেছিলেন?

বলেছিল, আমি এ বিয়ে মানি না।

বেশ রাগ করে বলেছিলেন কি?

খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল।

তখন আপনার কীরকম রি-অ্যাকশন হয়েছিল? আপনি কি ইনসাল্টেড ফিল করেছিলেন?

হ্যাঁ।

আর তাই আপনার ভিতর জিঘাংসা জেগে উঠেছিল?

ও কথা কেন বলছেন?

কারণ তারপরই আপনি তাকে অ্যাটাক করেন এবং রেপ করেন। আপনি কি জানেন যে স্ত্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে জোর করে মিলিত হলে সেটা রেপ-এর পর্যায়ে পড়ে। যদিও এদেশে সেটা বে-আইনি নয়।

তখন জানতাম না, কিন্তু এখন জানি। কিন্তু আমি সেই অপরাধটা করিনি।

আপনার ভিতরে অপরাধপ্রবণতা আছে, আপনি কুংফু ক্যারাটে জানেন, আপনার ইগো প্রবল। এসব কন্ডিশনগুলো আপনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। মিতালি দেবী তাঁর এক বন্ধুকে ঘটনাটা পরদিনই জানিয়েছিলেন।

তা হলে মিতালি বা তার বন্ধু কেউ একজন মিথ্যে কথা বলেছে।

বরুণ ঘোষ কবে মারা গেছেন আপনি জানেন ?

মাসখানেক আগে।

কীভাবে জানলেন ? বরুণ ঘোষের খবর কি কাগজে বেরিয়েছিল ?

লোকের মুখে শুনেছি।

সেই লোক কে, মনে আছে ?

ভাবলে মনে পড়বে হয়তো।

এগজ্যাক্ট ডেটটা জানেন ?

মনে নেই। তবে নভেম্বরের মাঝামাঝি বোধহয়।

কীভাবে মারা যান ?

থ্রম্বসিস বোধহয়। ওরকমই শুনেছিলাম।

আপনার সঙ্গে তাঁর শেষ কবে দেখা হয়েছিল ?

মনে নেই, বোধহয় উনি আমেরিকা যাওয়ার আগে।

আমার নাম শবর দাশগুপ্ত। খুবই বিচ্ছিরি নাম। তবে মা-বাবা নামটা শখ করে রেখেছিলেন, কী আর করা যাবে বলুন !

ঠিকই তো।

এমনকী নামটার অর্থও আমি ভাল করে জানি না। বাংলায় আমার বিদ্যের দৌড় খুবই কম। তবে যতদূর জানি শবর মানে ব্যাধ। তাই কি ?

বোধহয়।

হাঃ হাঃ। একদিক দিয়ে আমার নামটা খুবই সার্থক। ব্যাধ মানে শিকারি তো ? আমিও একজন ভাল শিকারি। আমার শিকার অবশ্য ক্রিমিনালরা। আই ক্যান অলওয়েজ স্মেল এ রটন্ র‍্যাট। হাঃ হাঃ।

আপনার কথা কি শেষ হয়েছে ?

আরে না। গলা শুকিয়ে গিয়ে থাকলে আপনি একটু ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিন বরং। আচ্ছা, মিতালি দেবী কবে খুন হন সে তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

হ্যাঁ, গত শনিবার।

শনিবার মিতালি ঘোষ একটা পার্টি দিয়েছিলেন।

জানেন ?

জানি।

জানবেনই তো। আপনি তো সেই পার্টির একজন ইনভাইটিও ছিলেন।

না।

ছিলেন না ? যাকগে, তবে আপনি সেই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন তো ?

আমি পার্টি জেনে যাইনি।

এমনিই গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

কার্টসি ভিজিট ?

না। মিতালির সঙ্গে আমার দেখা করার দরকার ছিল।

সে তো বটেই। তাকে আপনি খুন করতে গিয়েছিলেন

মিতালিকে খুন করে আমার কী লাভ ?

মোটিভের কথা বলছেন ? মোটিভ সবসময়ে তো আর মেটেরিয়ালিস্টিক হয় না। পুরনো অপমান, আহত অহং, সূক্ষ্ম জেলাসি, পরশ্রীকাতরতা, হেল্পলেস লাভ, হোপলেস রিলেশন—কত কারণ থাকতে পারে। আপনিই বলুন না আপনার মোটিভ কী ছিল।

আমি খুনটা করিনি মিস্টার দাশগুপ্ত।

সে কথা থাক। বলুন, পার্টিটা কোথায় হচ্ছিল।

নীচের তলায়। হলঘরে।

চমৎকার সিচুয়েশন, তাই না! নীচের তলায় পার্টি চলছিল, গোলেমালে আপনি ওপরে উঠে গিয়ে ঘাপটি মেরে মিতালি দেবীর শোয়ার ঘরে লুকিয়ে রইলেন। তারপর পার্টি শেষ করে একটু ড্রাংক এবং হাই অবস্থায় মিতালি দেবী যখন ওপরে উঠে এলেন, তখন—না মশাই, এ রকম গোল্ডেন সিচুয়েশন ভাবা যায় না।

কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমার সঙ্গে নীচের তলায় কয়েকজনের দেখা হয়েছিল। তারা আমার চেনা। পার্টি হচ্ছে দেখে আমি যে ফিরে আসি তা তারা জানে।

হ্যাঁ। আমরা তাদের স্টেটমেন্ট পেয়েছি। কিন্তু কথাটা হল, স্পট অব ক্রাইমে আপনাকে দেখা গিয়েছিল। ইউ ওয়্যার দেয়ার। তাই না ?

তা তো বটেই।

মিতালি দেবীর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল ?

হয়েছিল।

মানে মার্ডারের সময়ে তো ? আহা মশাই, ঝেড়েই কাশুন না।

মিতালিকে আমি খুন করিনি।

করেছেন, করেছেন। যাকগে, সব তথ্যই বেরিয়ে আসবে।

॥ দুই ॥

পাপী ! পাপী ! ঘোর পাপী ! বিড়বিড় করতে করতে চোখ মেলল সে। চোখ মেলে যা দেখল তাতে শিউরে উঠে ফের চোখ বন্ধ করে ফেলল। নরক ! নরক !

টেবিলের ওপর গত রাতের ভুক্তাবশেষ মাংসের হাড়, রুটির টুকরো, এঁটো প্লেট, একটা খালি আর একটা অর্ধেক খালি ব্ল্যাক নাইটের বোতল। মেঝের ওপর খানিকটা বমিও কি ? নরক ! নরক !

বিছানাটা মস্ত বড়। ও পাশে যে শুয়ে আছে তার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল না সমীরণের। জুলেখা শর্মাদের কখনওই সকালের দিকে অবলোকন করা উচিত নয়। সকালটা কখনওই নয় নষ্ট মেয়েছেলেদের জন্য। কাতর একটা অর্থহীন শব্দ করে নিজের ভারী মাথাটা তুলবার চেষ্টা করল সমীরণ। প্রতিদিন সকালে এটাই তার প্রথম ব্যায়াম—নিজেকে তোলা।

এত পাপ ভগবান সইছেন কী করে ? এতদিনে তাঁর বজ্র নেমে আসার কথা ! তবে কি তিনি আদতে নেই ? নাকি পৃথিবীতে পাপীর সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, তাঁর তত

বস্ত্রের স্টক নেই ?

বালিশের পাশে কর্ডলেস টেলিফোনটা পড়ে আছে। লো ব্যাটারির ইন্ডিকেটর জ্বলে আছে। দু'দিন বোধহয় চার্জ দেওয়া হয়নি। কত কী বকেয়া পড়ে আছে তার। এই যে জুলেখা, এ হল পরিবর্ত ব্যবস্থা, স্টপ গ্যাপ। তার একজন স্থায়ী মেয়েমানুষ আছে। ক্ষণিকা। না, বউ নয়। ক্ষণিকা দু'বার বিয়ে করেছিল। দু'বার ডিভোর্সের পর তৃতীয়বার আর বিয়ের মতো ভুল করেনি। সমীরণের সঙ্গে তার শর্ত ছিল, আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার। কেউ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না। এবং সমীরণকে ভাল করে বুঝতে হবে যে, ক্ষণিকা যেমন তার বউ নয়, তেমনি নয় রান্নার লোক বা ঝি। কেউ কারও বন্ধু বা বান্ধবী নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না। হ্যাঁ, আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কেউ কারও ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে না। তুমুল নারীবাদী ক্ষণিকা গত দু বছর ধরে তার লিভ ইন গার্ল ফ্রেন্ড। এই দুটো বছর এই ফ্ল্যাটের ভিতরে বিস্তর মেজাজের বিস্ফোরণ, ইগোর সঙ্গে ইগোর যুদ্ধ ও শান্তিস্থাপন, ভালবাসা ও ঘৃণা এবং লাভ হেট রিলেশন ও উদাসীনতা—এই সব কিছুই ঘটে গেছে। সে এক ভদ্রমহিলার চেহারা ও স্মার্টনেসের একটু বাড়াবাড়ি প্রশংসা করে ফেলায় ক্ষণিকা—ঘোরতর নারীবাদী ক্ষণিকা—কে বিশ্বাস করবে যে, রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে গত পনেরো দিন! মুক্ত নারীকে কি মানায় এই ঈর্ষা ? কিন্তু তর্ক করবে কার সঙ্গে সমীরণ ? তর্কে বহু দূর। এখন গিয়ে ক্ষণিকার কাছে তার ক্ষমা চাওয়া ও সেধে ফেরত আনার বকেয়া কাজটাও পড়ে আছে। জুলেখা অন্তর্বর্তীকালীন বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু জুলেখার কথা জানতে পারলে কপালে সমীরণের আরও কষ্ট আছে।

সে পাপী—এই সার সত্য সে জানে। পঞ্চ ম কারের কোনওটাই তার বাকি নেই। কিন্তু পাঁচটা ম-এর মধ্যে সে মেয়েমানুষ আর মদের কথা জানে। বাকি তিনটে ম কী কী ? সে অন্তত জানে না।

সমীরণ নিজেকে দাঁড় করাল। এক হাতে একটা বালিশ, অন্য হাতে কর্ডলেস টেলিফোন। জিভটা এত শুকনো যে, মুখে যেন কেউ একটা পাপোশ ঢুকিয়ে দিয়েছে। বালিশটা ফের বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে সে গিয়ে টেলিফোনটা চার্জে বসাল। এ কাজটা জরুরি। কল আসতে পারে।

এই রকম বিচ্ছিরি সকালে বাথরুমটা তার কাছে মরূদ্যানের মতো লাগে। জলের আর এক নাম জীবন না ? বেসিনের কল থেকে হাতের কোষে জল নিয়ে সে কয়েক ঢোঁক খেল। তারপর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সে তাকাল আয়নায়, নিজের দিকে।

পাপী ! পাপী ! এত পাপ কি তোর সইবে রে ? আকণ্ঠ ডুবে আছিস পাপে !

শাওয়ার খুলে দিল সমীরণ। কলকাতার শীত তীব্র নয় ঠিকই, কিন্তু তবু তো শীতকাল ! ঠাণ্ডা জলের শতধারার সূচিভেদ্য আক্রমণে প্রথমটায় শিউরে শিউরে উঠল সে। তারপর ভাল লাগতে লাগল। আঃ ! কী আরাম।

জলে পাপ ধুয়ে যায় না, সে জানে। তবু জল যেন তার গা থেকে বাসি, পচা, দুর্গন্ধযুক্ত একটা আস্তরণকে অপসারিত করছিল। স্নান করতে করতেই সে হাতঘড়িটা দেখল, যেটা প্রায় সহজাত কবচ কুণ্ডলের মতো প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই পরে থাকে সে। আটটা দশ ! অবিশ্বাস্য ! অবিশ্বাস্য ! কী করে এটা হয় তা আজও বুঝতে পারেনি সমীরণ। প্রতিদিন সকালে ঠিক একই সময়ে কেন ঘুম ভাঙে তার ? কেন প্রতিদিন সকালে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পায়, ঘড়িতে আটটা দশ ? অলৌকিক ছাড়া একে আর কী বলা যায় ?

স্নান করতে করতেই সে দাঁত ব্রাশ করল। তারপর শাওয়ার খোলা রেখেই বসল কমোডে। জল পড়ে যেতে লাগল বিনা কারণে। কিন্তু এ সময়ে এই জলের শব্দটা তাকে উদ্বুদ্ধ ও তৎপর করে। বয়ে যাচ্ছে জল, বয়ে যাচ্ছে আয়ু, বয়ে যাচ্ছে মহার্ঘ সময়। জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে

যায়... নাই নাই নাই যে সময়...সাড়ে নটায় তার অফিস...

কমোড থেকে উঠে সে ফের শাওয়ারের নীচে দাঁড়াল এবং দাড়ি কামিয়ে নিল। অনেকদিন আগে নন্দিতা বলেছিল, আপনার মুখে এক জোড়া গোঁফ রাখলে ভাল হত। এক একটা মুখ আছে, গোঁফ না থাকলে মানায় না।

তা হবে। কিন্তু গোঁফের অনেক ল্যাঠা। কেয়ারি করতে হয়, ছাঁটতে হয়, দু দিক সমান করতে হয়। তার সময় কোথায়? আজও তাই গোঁফ রাখা হয়নি তার। কোথায় ভেসে গেছে নন্দিতা! গোঁফ ছাড়াও তার তো দিব্যি চলে গেল এতগুলো বছর!

কত বছর? সে কি চল্লিশের কাছাকাছি? না, সে বয়স নিয়ে মোটে ভাববে না, ভাবতে চায় না। বয়স মানেই একটা ভয়। একটা জ্বালা। একটা উদ্বেগ।

যখন সে বাথরুম থেকে বেরোল তখনও বিছানার দিকে তাকানোর ইচ্ছে হল না তার। লণ্ডভণ্ড বিছানার একপ্রান্তে এখনও জুলেখা শুয়ে। থাকগে। ঘুম ভাঙলে আপনি চলে যাবে। এগারোটায় ওর স্কুল।

স্নান করে আসার পর নিজের শোয়ার ঘরের দুর্গন্ধ ও নারকীয় পরিবেশ তাকে যেন আরও তাড়া দিচ্ছিল বেরিয়ে পড়ার জন্য। ঘরের বাইরেও একটা নোংরা, গান্ধা শহর। তবু আলো আর হাওয়ার প্রবহমানতা আছে।

নরক! নরক! বলতে বলতে সে পোশাক পরল। চায়ের জল গরম করে টি ব্যাগ ডোবাল। বাইরের ঘরটা এখনও তত সংক্রামিত নয়। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। তবে ফ্লাওয়ার ভাসে বাসি ফুল তার সহ্য হয় না। গত পনেরো দিন ধরে বা তারও বেশি এক গোছা হরেকরকম ফুল পচছে, শুকোচ্ছে, নেতিয়ে পড়ছে। কেউ ফেলার নেই। ফুলগুলোর দিকে অনিচ্ছের চোখে চেয়ে সে চা খেল।

পাপ কখনও গোপন থাকে না। ফুটে বেরোবেই। আর সেই কারণেই সমীরণ কখনও কিছু লুকোছাপা করে না। তার জীবন হল খোলা বই। এই যে শোয়ার ঘরে জুলেখা শুয়ে

আছে, একটু বাদেই ঠিকে ঝি নবর মা এসে ওকে দেখবে। গত দশ বারো দিন ধরে দেখছেও। এখন যদি হুট করে ক্ষণিকা চলে আসে, তা হলে সে-ও দেখবে। না দেখলেও ক্ষণিকা জানতে পারবে ঠিকই, তারপর অনেক অশান্তি হবে। সব জানে সমীরণ, তবু কিছুই লুকোয় না।

হাই!

সমীরণ একটু চমকে গিয়েছিল। হাতের কাপ থেকে চলকে একটু চা পড়ল হাঁটুতে। ছ্যাঁক।

হাই! ঘুম ভাঙল?

ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে মস্ত একটা হাই তুলল জুলেখা। ছোটখাট শ্যামলা, ছিপছিপে মেয়েটি চোখে পড়ার মতো নয়। তবে চলাফেরায় একটা বেড়ালের মতো চকিত তৎপরতা আছে। একটা ফিরিঙ্গি স্কুলে ও ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর। ইউ পির মেয়ে, কলকাতায় জন্ম-কর্ম। আর বিশেষ কিছুই জানা নেই সমীরণের। জানার অনেক ল্যাঠা।

জুলেখা আর একটা হাই তুলে বলল, ইটস বোরিং।

হোয়াট ইজ বোরিং?

এভরিথিং।

সমীরণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, ঠিক কথা। জীবনটাই ভারী একঘেয়ে। নাথিং হ্যাপেনস। সোমবার ঠিক মঙ্গলবারের মতো, মঙ্গলবার ঠিক বুধবারের মতো, অ্যান্ড সো অন।

চা খাব।

খাও। জল গরম করা আছে।

তোমার ফোন বাজছে। ধরো।

জ্বালালে।

চলে গিয়ে ফোনটা ধরল সমীরণ। কানে লাগিয়ে হ্যালো বলেই চমকে উঠে কান থেকে ফোনটাকে একটু তফাতে ধরল সে। তার বাবা মধু বাগচী যাত্রা দলে ঢুকলে নাম করতে পারতেন। গলার রেঞ্জ সাংঘাতিক। রেগে গেলে আরও মারাত্মক। এখন সেই মারাত্মক মাত্রায় গলাটা তাকে

ধমকাচ্ছে, কী ভেবেছ তুমি। সারারাত ফুর্তি করে সকালে হ্যাংওভার নিয়ে পড়ে থাকলেই হবে? তোমাকে কতবার বলেছি, আজ শুক্রবার অফিসের আগে মিস্টার ভার্মার বাড়ি থেকে একটা জরুরি ফাইল নিয়ে আসবে! উনি অপেক্ষা করছেন। আর একটু বাদেই উনি একটা ফ্লাইট ধরতে বেরিয়ে যাবেন!

যাচ্ছি বাবা, এখনই যাচ্ছি।

রিচ হিম উইদিন ফিফটিন মিনিটস। ফিফটিন! হার্ড মি?

ইয়েস। ফিফটিন।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই ডোরবেল বাজল। এ সময়ে বাজবার কথা নয়। এ বাড়িতে খবরের কাগজ বা গয়লা আসে না। নবর মা আসে এগারোটার পর। সে ডোরবেল বাজায় না, তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। সাধাসাধি না করলে ক্ষণিকা নিজে থেকে ফিরে আসার মেয়ে নয়।

একটু চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন সমীরণ গিয়ে দরজাটার দিকে হাত বাড়িয়ে জুলেখাকে বলল, টু বি অন দি সেফ সাইড, তুমি বরং শোয়ার ঘরে যাও।

যাচ্ছি। বলে জুলেখা একটা হাই তুলল। তারপর সে বেশ ধীরে সুস্থে শোয়ার ঘরে চলে গেল।

দরজা খুলে সমীরণ যাকে দেখল সে বেশ ছোটখাট মানুষ। গোঁফ আছে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। চেহারা রোগা। পরনে কালো ট্রাউজার্স আর একটা কট্‌স্ উলের সবুজ চেকওলা হাওয়াই শার্ট, বিনা হাস্যে বলল, আসতে পারি?

সমীরণ দরজা না ছেড়ে বলল, কী চাই?

আপনাকেই।

কী দরকার?

লোকটা বুক পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে দেখিয়েই পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, তদন্ত। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট।

সমীরণ একটু ক্যাবলা হয়ে গিয়ে বলল, তদন্ত মানে সেই ইয়ের কেসটা কি ? একবার তো এনকোয়ারি হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সেই ইয়ের কেসটাই। এনকোয়ারি বার বার হবে। এবারেরটা গুরুতর। পরশু দিনও এসেছিলাম। আপনি বেশ সকালেই অফিসে বেরোন দেখছি।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবে পরশু অবশ্য আপনার কাজের মেয়েটির সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছে। রিগার্ডিং ইউ। আমি ভিতরে এলে কি আপনার অসুবিধে হবে ? ভিতরে গার্ল ফ্রেন্ড-ট্রেন্ড কেউ আছে নাকি মশাই ?

না না। আসুন।

থাকলেও আমি মাইন্ড করব না। তাকেও হয়তো প্রয়োজন হবে। মার্ডার কেস যে কোথা থেকে কোথায় গড়ায় !

সমীরণ লোকটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, বসুন। কিন্তু আমি একটা জরুরি কাজে বেরোচ্ছিলাম।

আমার কাজটা কি কম জরুরি ? এখন যদি আপনি কাজ দেখান তাহলে আপনাকে আমার অফিসিয়ালি থানায় টেনে নিয়ে যেতে হবে।

আতঙ্কিত সমীরণ বলল, প্লিজ ! তা হলে আমি বাবাকে একটা টেলিফোন করে নিই ? উনিই আমার বস।

জানি। কর্ডলেস টেলিফোনটা এই ঘরে নিয়ে এসে কথা বলুন। আর গার্ল ফ্রেন্ডটিও এখানে স্বচ্ছন্দে এসে বসতে পারেন।

সমীরণ টেলিফোনটা নিয়ে এল। খানিকটা চার্জ নিয়েছে। চলবে। সে লাইনটা অন করে ডায়ালের বোতাম টিপতে টিপতে বলল, জুলেখা টয়লেটে গেছে। এসে যাবে।

বেফাঁস বলা। টেলিফোনে তার বাবার গলা হঠাৎ ফেটে পড়ল, জুলেখা টয়লেটে গেছে ? হোয়াট ডু ইউ মিন ? কে

জুলেখা ? আর তার টয়লেটে যাওয়ার খবর তুমি এই সাতসকালে আমাকে শোনাচ্ছ কেন ?

আপনাকে নয়।

আমি জানতে চাই তুমি এখনও বেরিয়ে পড়োনি কেন ? তোমাকে বলেছিলাম কি না ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে ভার্মাকে রিচ করতে হবে !

হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কী সমস্যা ? জুলেখা কে ? তার টয়লেটে যাওয়াটাই তোমার সমস্যা নাকি ?

না বাবা। আই অ্যাম আন্ডার অ্যারেস্ট।

অ্যারেস্ট ! বলে বাবা এমন চেঁচাল যে, মানুষ অত জোরে সচরাচর চেঁচাতে পারলে টেলিফোন যন্ত্রটারই দরকার হত না।

অ্যারেস্ট ! আমি ঠিক শুনেছি তো !

ঠিকই শুনেছেন। তবু আমি ভেরিফাই করে নিচ্ছি। বলে মাউথপিসটায় হাত চাপা দিয়ে সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, অ্যাম আই আন্ডার অ্যারেস্ট ?

না না। বরং ইউ আর আন্ডার স্ক্রুটিনি।

মাউথপিসটা থেকে হাত সরিয়ে সমীরণ বলল, ইনি বলছেন, ঠিক অ্যারেস্ট নয়, আই অ্যাম আন্ডার স্ক্রুটিনি। ব্যাপারটা কী তা আমি জানি না।

কেন, তোমাকে স্ক্রুটিনিই বা করা হচ্ছে কেন ? তুমি কী করেছ !

মনে হচ্ছে সেই ইয়ের কেসটা—

কোন কেসটা ? কিসের কেস ?

একটা মার্ডার কেস।

মাই গড ! মার্ডার কেস ! মার্ডার কেস ! ঠিক শুনছি ?

ঠিকই শুনেছেন। ইনি বোধহয় আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন। ভার্মার ফাইলটা তাই আমার পক্ষে আনা সম্ভব হচ্ছে না।

হ্যাং ভার্মা। পুলিশ অফিসারকে ফোনটা দে, আমি ওঁর

সঙ্গে কথা বলতে চাই।

লোকটাকে কিছু বলতে হল না, নিজেই হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিয়ে তার বাবাকে বলল, ঘাবড়াবেন না, আপনার ছেলেকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি।

বাবার গলা টেলিফোন থেকে দু'হাত দূরে দাঁড়িয়েও শুনতে পেল সমীরণ। বাবা বলল, কার মার্ডার ? কিসের মার্ডার ?

মিতালি ঘোষ নামে একটি মেয়ের।

তার সঙ্গে আমার ছেলের কী সম্পর্ক ?

সম্পর্কটা গোলমেলে। তবে ক্রমশ সব জানা যাবে।

আমার যে প্যালপিটিশন হচ্ছে।

একটা সর্বিট্রেট খেয়ে নিন।

শুনুন অফিসার, আমার এই সেজো ছেলেটা অত্যন্ত ইররেগুলার। বোধহয় লম্পটও এবং একটি মিটমিটে বদমাশ।

আজকাল কে নয় ? দি ইয়ং জেনারেশন ইজ টোটালি স্পয়েল্ট। তার জন্য আপনারা অর্থাৎ পেরেন্টসরাই বেশি রেসপনসিবল।

ও.কে., ও.কে.। কিন্তু আমার কথাটা শেষ হয়নি। আমি বলছিলাম কী, হি হ্যাজ হিজ ভাইসেস। কিন্তু হি ইজ কমপ্লিটলি ইনক্যাপেবল টু কমিট মার্ডার, হি ইজ নট ব্রট আপ দ্যাট ওয়ে।

হু নোজ ? তবে আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট উনি এখনও নন। ওঁর কাজটা আজ আপনি চালিয়ে নিন।

কিন্তু আপনাদের প্রশ্নোত্তরগুলো যে আমার জানা দরকার। আই অ্যাম ওরিড।

উপায় কী বলুন। ইন্টেরোগেশনের রানিং কমেন্টারি তো আপনাকে শোনানো যাবে না।

আমি কি আসব ?

না। আপাতত ওকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না। আপনি পরে ওঁর কাছ থেকে শুনে নেবেন। ছাড়ছি।

আচ্ছা, আচ্ছা।

ফোনটা অফ করে লোকটা সমীরণের হাতে সেটা দিয়ে বলল, হ্যাপলেস পেরেন্টস। যান, ওটা চার্জে বসিয়ে আসুন।

পাপ ! পাপ ! পাপ ছাড়া কি তার জীবনে কিছু নেই ? তার জীবন পঞ্চ ম-কারে আকীর্ণ। কিন্তু মার্ডার ম দিয়ে শুরু হলেও বোধহয় পঞ্চ ম-কারের মধ্যে পড়ে না।

ভিতরের ঘরে এসে কর্ডলেসটা চার্জে বসিয়ে সে কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা করল। সকালবেলায় তার মাথা এমনিতেই ভাল কাজ করে না। তার ওপর এই সব উল্টোপাল্টা ঘটনায় সে বিভ্রান্ত। এখন দরকার মেডিটেশন। আজকাল স্ট্রেস কাটানোর জন্য অনেকেই মেডিটেশন ধরেছে। ব্যাপারটা কেমন তা অবশ্য সে ভাল করে জানে না। যোগ ব্যায়াম, ধ্যান ইত্যাদির কথা সে খুব শুনতে পায় আজকাল। খানিকক্ষণ চোখ বুজে সে নিজেকে জড়ো করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল মাত্র। তারপর গিয়ে বাথরুমের দরজায় টোকা দিয়ে চাপা জরুরি গলায় ডাকল, জুলেখা ! জুলেখা !

ভিতরে শাওয়ার চলছে। জুলেখা শুনতে পেল না।

টেবিল থেকে চাবিটা তুলে এনে সেইটে দিয়ে দরজায় নক করল সে।

শাওয়ার বন্ধ হল, জুলেখা বলল, কে ?

আমি। একটু তাড়াতাড়ি করো।

কেন ? উইল ইউ গো টু দি পি ? আর একটা বাথরুম তো রয়েছে।

নো, আই ওন্ট গো টু দি পি। বাট দেয়ার ইজ অ্যানাদার পি হিয়ার। পুলিশ।

পুলিশ ? যাঃ, তুমি ইয়ার্কি করছ।

মাইরি না।

পুলিশ কী চায় ?

ইন্টেরোগেট করতে এসেছে।

আমাকে ? আমাকে কেন ?

তোমাকেও। আমার সম্পর্কে হয়তো জানতে চাইবে।

ডোন্ট ওরি। আই শ্যাল পেইন্ট ইউ ইন পিংক।

ইয়ার্কি নয়। সিরিয়াস ব্যাপার। আই মে বি আন্ডার অ্যারেস্ট।

কেন, তুমি কী করেছ ?

পাপ ! বিস্তর পাপ করেছি। কিন্তু পুলিশ যে পাপটার কথা বলছে সেটা আমি করিনি।

ভেবো না। আমি পুলিশের মেয়ে, পুলিশের নাতনি। আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন এ পুলিশ কোয়ার্টার। পুলিশের কোলে চড়েই বড় হয়েছি।

চমৎকৃত হয়ে সমীরণ বলল, এসব আগে বলতে হয়। আই অ্যাম ইমপ্রেসড, ইউ আর অ্যান অ্যাসেট।

পুলিশ কেন এসেছে বলো তো ! হ্যাভ ইউ কমিটেড এনি ক্রাইম ?

আমার এক বান্ধবী সম্প্রতি খুন হয়েছে।

বান্ধবী ?

ইট ওয়াজ অল ইন দি নিউজপেপারস। মিতালি ঘোষ।

আমি খবরের কাগজ পড়িই না। ঠিক আছে, তুমি গিয়ে কথা বলো। আমি আসছি।

এই শীতেও কি একটু ঘাম হচ্ছে তার ? কে জানে কেন, ছোটখাট, আনইমপ্রেসিভ চেহারার পুলিশ অফিসারটির সামনে তার কিছু অস্বস্তি হচ্ছে। সে ঘরে ঢুকতেই অফিসারটি কান থেকে একটা ছোট্ট যন্ত্র খুলে তার গুটিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, ওয়েল ডান।

তার মানে ?

আমি এতক্ষণ আপনাদের ডায়ালগ শুনছিলাম।

কীভাবে শুনছিলেন ? এনি ইলেকট্রোনিক ডিভাইস ? আজকাল যে কত কিম্ভূত যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে, একটুও শান্তি বা সেকলুশন থাকছে না।

এটা একটা ইমপ্রোভাইজড হিয়ারিং এইড। খুব

সফিস্টিকেটেড কিছু নয়, তবু ভাল কাজ দেয়। বসুন।

সমীরণ বসল।

মিতালি দেবী কি আপনার বাল্যবান্ধবী?

আমরা স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম।

তিনি কেমন মেয়ে ছিলেন?

ব্রাইট। মেরিটোরিয়াস।

সেটা আমরা জানি। আদার সাইডস?

খুব মিশুকে ছিল। একটু রোমান্টিক।

ডাক্তারি পড়ার সময়ে ওঁর বিয়ে হয়ে যায়, তাই না?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

এত আরলি এজে বিয়ে হয়েছিল কেন, জানেন?

সমীরণ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, ওর মা নেই। বাবা আর ও। বোধহয় ওর বাবা ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন। সেইজন্যই—

ওঁর বাবা বরুণ ঘোষের ক্যানসার হয়েছিল বলে ডাক্তার একটা ভুল ডায়াগনসিস করে। ঘটনাটা আপনি জানেন?

না। আসলে স্কুলের পর আর আমাদের বিশেষ মেলামেশা ছিল না। টেলিফোনে কথা হত। বিয়ের নেমন্তন্নেও গিয়েছিলাম।

এত আরলি এজে কেন বিয়ে হচ্ছে তা জানতে চাননি?

হ্যাঁ। কিন্তু ও ভেঙে কিছু বলেনি।

বিয়েতে কি ওঁর আপত্তি ছিল?

ছিল। বলেছিল বাবা ওকে প্রেশার দিয়ে বিয়ে দিচ্ছে।

প্রেশারের কারণ কি সাসপেক্টেড ক্যানসার?

আমি ঠিক জানি না। হতে পারে।

আপনি হয়তো আরও কিছু জানেন। বলতে চাইছেন না।

না, ঠিক তা নয়।

মিতালি দেবীর হাজব্যান্ড মিঠু মিত্রকে আপনি চেনেন?

চিনি।

কীভাবে চেনেন?

ওদের বিয়ের সময়ে পরিচয় হয়েছিল। পরে বন্ধুত্বের মতোই হয়েছিল।

কিন্তু বিয়ে তো ভেঙে যায়। এক মাস পরই মিতালি দেবী চলে আসেন।

হ্যাঁ। কিন্তু মিঠুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তাতে কেটে যায়নি।

সম্পর্কটা কীরকমভাবে হল ?

ঘটনাটা ইন্টারেস্টিং। বলব ? আপনার কি অত সময় আছে ?

আছে। বলুন।

বউবাজারে আমাদের একটা জুয়েলারির দোকান আছে। তখন আমরা দুই ভাই ওখানে বসতাম। একবার দোকানে একটা ডাকাতি হয়। ডাকাতির পর বাবা ডিসিশন নেন আমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস দরকার এবং মার্শাল আর্টও রপ্ত করা প্রয়োজন। আমি জীবনে ব্যায়াম ট্যায়াম কখনও করিনি।

সেটা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়।

যায় ?

যায়। তবে আপনি তো হ্যাপি লাইফ কাটান। হ্যাপিনেসের হ্যাপা হল হেলথ হ্যাজার্ডস।

বাঃ, আপনি বেশ অ্যালিটেরেশন করতে পারেন।

তারপর বলুন।

হ্যাঁ। মিতালির বর যে একজন মার্শাল আর্টিস্ট তা আমার জানা ছিল। মিঠুর কাছে আমরা দুই ভাই ওসব শিখতে যেতাম। সেই থেকেই বেশ ভাব হয়ে যায়।

মিঠু মিত্র কেমন লোক ?

ভাল। খুব ভাল।

তা হলে আপনার বান্ধবী মিতালি তাকে পছন্দ করেননি কেন ?

কে কাকে পছন্দ করবে বলা মুশকিল।

আমি জানতে চাই মিঠু মিত্রকে অপছন্দ করার বিশেষ

কোনও কারণ মিতালি দেবীর ছিল কি না।

আমি জানি না।

ঠিক আছে। অন্তত এটা তো জানেন, বিয়ের আগে মিতালি দেবী আর কোনও ছেলেকে পছন্দ করতেন কি না।

আপনি কি পাণ্টুর কথা জানতে চাইছেন। দেখুন, ও কেসটা স্যাড। মিতালি একটা মারাত্মক ভুল করেছিল। ভুল বুঝতে পেরে সে ফিরেও আসে।

একটু ডিটেলসে বলবেন কি?

ব্যাপারটা হল, মিতালি একটু রোমান্টিক টাইপের। পাণ্টু ছিল ওর পাড়ার মস্তান। এ ব্যাড টাইপ। কিন্তু বেশ রোখা-চোখা, সাহসী। মিতালি ইনভলভড হয়ে গিয়েছিল। ওর বাবা ভয়ঙ্কর রেগে যাবেন বলে মিতালি ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে যায়। বিগ ব্লান্ডার। ছেলেটার রোজগারপাতি ছিল না, যোগ্যতাও নয়। মিতালি ছ'মাস বাদে বাবার কাছে ফিরে আসে। এ রেক অফ এ গার্ল। মেয়ে চলে যাওয়ার পর ওর বাবা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। শরীরও ভেঙে যায়। মিতালি ফিরে এলেও ওর বাবা সেই শকটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু আমি মনে করি, এ রকম ভুল যে কেউ করতেই পারে। অল ইন দি লাইফস গেম।

ঘটনাটা কি মিঠু মিত্র জানতেন?

বোধহয়, মিতালির বাবাই হয়তো ওকে বলেছিলেন।

আপনি সিওর নন?

আমি প্রসঙ্গটা কখনও তুলিনি। মনেও হয়নি।

পাণ্টু এখন কোথায়?

জানি না। ওকে আমি এক আধবার দেখেছি।

বিয়েটা যে ভেঙে গেল তা পাণ্টুর ব্যাপারটার জন্য নয় তো!

আরে না। মিতালি তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। পাণ্টুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল মন থেকে।

ওদের কোনও ইস্যু হয়েছিল কি? মানে পাণ্টু আর মিতালির?

না না।

মিঠু মিত্র পাণ্টুর কথা জেনে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল—এমন কি হতে পারে?

না, কখনওই নয়। বিয়েটা ভেঙেছিল মিতালিই।

ঠিক জানেন?

হান্ড্রেড পার্সেন্ট।

এবার বলুন, পার্টির দিন আপনি কোথায় ছিলেন।

পার্টিতেই ছিলাম। আই ওয়াজ অ্যান ইনভাইটি।

পার্টিতে কী হয়েছিল?

মিতালি অনেককে নেমন্তন্ন করেছিল।

অকেশনটা কী?

গেট টুগেদার।

কীরকম পার্টি?

ককটেল ডিনার।

মিঠু মিত্রকে কি নেমন্তন্ন করা হয়েছিল?

মাই গড! না।

তবু মিঠু মিত্র সেইদিন মিতালি দেবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়।

কখন এবং ঠিক কোথায়?

আমি তখন গাড়ি থেকে নামছি। দেখি মিঠু কম্পাউন্ডের ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। মিঠুর প্রেস্টিজবোধ প্রবল।

তিনি কেন এসেছিলেন সে-বিষয়ে কিছু বলেছিলেন আপনাকে?

না। হি ইজ এ রিজার্ভড ম্যান। আগ বাড়িয়ে বলে না।

আপনাদের মধ্যে কি কিছু কথাবার্তা হয়েছিল?

সামান্য। মিঠু খুব অন্যমনস্ক ছিল। আমি বললাম, কী খবর? ও বলল, ভাল।

উনি কি গাড়িতে এসেছিলেন?

না। মিঠুর একটা বুলেট মোটরবাইক আছে। সেইটেতে

চড়ে চলে গেল। খুব স্পিড দিয়েছিল মনে আছে ?

আপনি কি মিতালি দেবীকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন ?

করেছিলাম।

তিনি কী বললেন ?

ওকে খুব ডিস্টার্বড দেখলাম।

কীরকম ? খুলে বলুন।

আনইজি লাগছিল। একটু যেন রেস্টলেস। আমাকে হঠাৎ বলল, আমি জীবনে বারবার ভুল করি কেন বলো তো !

ব্যস, এইটুকু ?

না। আরও একটু বলেছিল।

কীরকম ?

বলল, আই মাস্ট রিকনসাইল।

কার সঙ্গে।

সেটা স্পষ্ট করে বলেনি। আন্দাজ করছি, মিঠুকেই মিন করছিল।

হাউ ডু ইউ নো ?

আমি তো বলেইছি, ওটা আমার আন্দাজ।

সেদিন কি মিতালি দেবী খুব ড্রিঙ্ক করেছিলেন ?

হ্যাঁ। মিতালি মদ খেত না কখনও। আমেরিকাতেও না। আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখত। তাতে প্রায়ই থাকত ও আমেরিকায় নেশার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করতে চায়।

তবু সেদিন উনি ড্রিঙ্ক করেছিলেন ?

হ্যাঁ, উল্টোপাল্টা খাচ্ছিল। কখনও হুইস্কি, কখনও শেরি, কখনও বিয়ার বা রাম। বোঝা যায় ও ড্রিঙ্ক করতে জানেই না।

তারপর কী হল ?

মশাই, মুশকিলে ফেললেন।

কেন ?

আমি পাপী-তাপী লোক। মদ আমিও খাই। পার্টি কিছুক্ষণ চলার পর আমি কি আর চৈতন্যে ছিলাম ?

আউট হয়ে গিয়েছিলেন ?

ঠিক তা না হলেও আই ওয়াজ এক্সট্রিমলি হাই। ডিনার টেবিলে বসেও আমি নাকি কিছুই খেতে পারিনি।

তারপর ?

ক্ষণিকা আমাকে ফিরিয়ে আনে।

ক্ষণিকা কে ? যিনি বাথরুমে আছেন ?

না। এ জুলেখা।

আপনার ক'জন ?

একজনই। ক্ষণিকা। এ হল স্টপ গ্যাপ।

একে কোথায় পেলেন ?

জুটে যায়।

আপনি ভাগ্যবান লোক। আচ্ছা, মিঠু মিত্র আপনাকে কোথায় কারাটে শেখাতেন ?

সাদার্ন ক্লাবে। লেক-এর কাছে।

আপনি কতদিন শেখেন ?

বেশি নয়। মাস খানেক। কারাটে ইজ এ বোরিং থিং। সিনেমা টিনেমায় দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু শেখা ভীষণ একঘেয়ে। এক জিনিস হাজারবার করতে হয়।

ক্ষণিকা দেবী এখন কোথায় ?

ক্ষণিকা ! ওঃ ! সে বাপের বাড়িতে।

উনি কি আপনাকে ছেড়ে গেছেন ?

বোধহয় না। টেম্পোরারি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং।

সেটা কীরকম ? জুলেখা দেবীই কি কারণ ?

না না। জুলেখা ইজ নো ম্যাচ ফর হার। ব্যাপারটা খুলেই বলি।

বলুন।

ওয়ানস আই ওয়াজ ইন লাভ উইথ মিতালি।

তাই নাকি ?

ইট ওয়াজ ন্যাচারাল। মিতালির ডান গালে একটা আঁচিল আছে। আপনি দেখেননি, তাতে ওকে কী সুন্দর দেখাত ! ইন ফ্যাক্ট সেভেন্টি পারসেন্ট অফ হার মেল ক্লাসমেটস ওয়্যার

ইন লাভ উইথ হার।

তারপর বলুন।

অবশ্য কাফ লাভ। ওসব ভুলে যেতে দেরি হয় না। তারপর মিতালি যখন আমেরিকা থেকে ফিরে এল আই ওয়াজ সেকেন্ড টাইম ইন লাভ উইথ হার। আমেরিকায় গিয়ে ও আরও সুন্দর এবং স্মার্ট হয়েছে। অনেক ম্যাচিওরডও। এইসব কথা আমি ক্ষণিকাকে বলেছিলাম।

বটে?

হ্যাঁ। অ্যান্ড ক্ষণিকা ওয়াজ ক্রস। পার্টি থেকে আমাকে নিয়ে এসে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সে সোজা বাপের বাড়ি চলে যায়।

কেন, পার্টিতে কিছু হয়েছিল?

আমি নাকি মাতাল অবস্থায় মিতালির প্রতি প্রেম নিবেদন করে ফেলেছিলাম। কিন্তু মাতালের কথা কি ধরতে আছে, বলুন? শি ইজ সো জেলাস!

বেশি জেলাসি থেকে মানুষ খুনও করতে পারে!

আতঙ্কিত সমীরণ বলল, না না! কী যে বলেন! ক্ষণিকা ওরকম মেয়ে নয়।

কিরকম মেয়ে?

কোয়াইট রেসপনসিবল। সোশ্যাল ওয়ার্কও করে।

আপনি কি বলতে পারেন মিতালি দেবীর আমেরিকায় কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে কি না!

নেই।

কীভাবে জানলেন যে নেই?

থাকলে আমাকে জানাত।

উজ্জ্বল সেন বলে কারও নাম শুনেছেন?

শুনেছি। উজ্জ্বল ওর বন্ধু ঠিকই, কিন্তু যাকে বয়ফ্রেন্ড বলে তা নয়।

উজ্জ্বল কী করেন?

আমেরিকায় ওর ব্যবসা আছে।

কিসের ব্যবসা?

বোধহয় সফটওয়্যার।

বোধহয় বলছেন কেন?

সেইরকমই শুনেছিলাম যেন।

ওঁদের মধ্যে কোনও অ্যাফেয়ার ছিল না বলছেন!

না না। থাকলে মিতালি আমাকে জানাত।

বরুণ ঘোষের সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল?

সামান্য।

কীরকম লোক ছিলেন?

লোনলি। আপনমনে থাকতেন।

আপনার ব্লাডপ্রেশার কত?

প্রেশার? তা তো জানি না। কেন বলুন তো?

মাঝে মাঝে চেক করানো ভাল। আপনার ফোন বাজছে। বোধহয় আপনার বাবা। গিয়ে ফোনটা ধরুন।

বাবাই। ফোন ধরেই কানের কাছ থেকে যন্ত্রটাকে তফাত করতে হল। বাবা চেঁচাচ্ছিল, কী হল? কী হয়েছে? বলবি তো।

কিছু হয়নি। আমরা অ্যামিকেবলি কথা বলছি।

অ্যারেস্ট করেনি তো!

না বাবা।

তেমন বুঝলে আমাদের বিরজা উকিলকে খবর দিতে পারি।

এখনই দরকার নেই।

কে খুন হয়েছে বলছিলি?

আমার এক বান্ধবী।

কুলাঙ্গার কোথাকার!

বাবা ফোন রেখে দেওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সমীরণ।

সামনের ঘরে ঢুকতেই দেখল, লোকটা আবার তার হিয়ারিং এইডটা কান থেকে খুলে পকেটে রাখল। তারপর বলল, আপনার বান্ধবী বাথরুমে একটু বেশি সময় নিচ্ছেন!

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাথরুম ওর খুবই প্রিয় জায়গা, ডাকব কি?

ডাকুন।

সমীরণ গিয়ে বাথরুমের দরজায় টোকা দিয়ে বলল, হয়েছে জুলেখা ?

যাচ্ছি।

আরও মিনিট পাঁচেক পর জুলেখা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে সামনের ঘরে এল। হেসে বলল, হাই। আমি জুলেখা।

অফিসার বলল, আমি শবর দাশগুপ্ত। গোয়েন্দা।

হাউ থ্রিলিং!

আপনি একজন পুলিশ অফিসারের মেয়ে ?

হ্যাঁ। আমার বাবার নাম বিজয় শর্মা। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। রিটায়ার্ড।

সমীরণবাবুর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয় ?

জাস্ট বারো দিন।

কীভাবে ?

উই ওয়্যার টু লোনলি পিপল। উই মেট সামহোয়ার। অ্যান্ড দ্যাটস দ্যাট।

আপনি চাকরি করেন ?

হ্যাঁ, মেরিজ স্কুলে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর।

ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ?

সিঙ্গল।

একা থাকেন না বাবা-মার সঙ্গে ?

একা। বাবা-মা আমার লাইফ স্টাইল পছন্দ করেন না।

সমীরণবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়াটা কি অ্যাকসিডেন্টাল ?

হ্যাঁ।

কোথায় দেখা হল ?

একটা বার-এ।

বার-এ ? আপনি কি ড্রিংক করেন ?

অকেশনালি। যখন বোরিং বা লোনলি ফিল করি।

আর ইউ ইন লাভ ?

হিঃ হিঃ। ডোন্ট নো।

আপনি কি জানেন যে, ওঁর আর একজন গার্ল ফ্রেন্ড

আছেন ?

জানব না কেন ?

আপনি মিতালি ঘোষের কথা শুনেছেন ?

না।

হাউ ডিড ইউ ফল ফর হিম ?

জুলেখা মুচকি হাসল, উইল ইউ বিলিভ ?

হোয়াই নট ?

হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ স্কেয়ারড অফ গোস্টস।

ভূতের ভয় ?

ঠিক তাই।

শবর সমীরণের দিকে চেয়ে বলে, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন ?

সমীরণ ভারী লজ্জিত হয়ে বলে, বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ভয় পাই। বিশেষ করে মিতালি খুন হওয়ার পর থেকে।

সত্যি ?

আজ্ঞে।

মিস শর্মা, তারপর বলুন।

আই অ্যাম ন্যাচারালি অ্যাট্রাক্টেড টু লোনলি পিপল। সমীরণকে আমার ভাল লেগেছিল।

এর আগে অন্য কোনও মানুষের সঙ্গে এভাবে বাস করেছেন ?

মাত্র একবার। তবে পল্লবের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ারই কথা ছিল। একটা অ্যাকসিডেন্টে সে মারা যায়। এক বছর আগে। আই লিড এ লোনলি লাইফ।

আপনার ঠিকানা ?

থ্রি এ বাই ওয়ান লিটন স্ট্রিট। রুম নম্বর টুয়েন্টি থ্রি।

এটা কি বোর্ডিং হাউস ?

হ্যাঁ। কিন্তু এই মার্ডার কেসটার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার সম্পর্ক নেই ? আমি কি যেতে পারি ? আমার স্কুলে আজ ফেট আছে।

পারেন।

বাই দেন।

বাই।

জুলেখা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল শবর। দরজা বন্ধ হওয়ার পর বলল, ইজ শি টেলিং দি ট্রুথ ?

মোর অর লেস।

হোয়াই লেস ?

ওটা কথার কথা। ও ঠিকই বলেছে।

কোন বার-এ আপনাদের দেখা হয়েছিল ?

মদিরা।

আপনি সেখানে রেগুলার যান ?

যাই। বেশ সেকলুডেড জায়গা। গাড়ি পার্ক করার জায়গা আছে।

জুলেখাও কি যায় ?

না। সেদিনই ওকে প্রথম দেখলাম।

কীভাবে পরিচয় হল ?

ও একটু হাই ছিল। এসে আমার টেবিলে বসল। অ্যান্ড উই টকড।

তারপর ?

তারপর তো দেখছেন।

ক্ষণিকা দেবী রাগ করবেন না ?

করবে। এখনও হয়তো জানে না। জুলেখা অবশ্য জানে যে, এটা কোনও পার্মানেন্ট ব্যবস্থা নয়। খুব কনসিডারেট মেয়ে।

শুধু ভূতের ভয়ের জন্য আপনি বান্ধবী জোগাড় করেছেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

বিশ্বাস করুন। বাস্তবিকই আমার ভীষণ ভূতের ভয়। পাপী তো, আমার কেবলই মনে হয় মৃতদের আত্মারা আমার কাণ্ড দেখে রেগে যাচ্ছে। বাগে পেলেই এসে গলা টিপে ধরবে।

তিন

(এক) শোনো,

আমি আজ তোমাকে যা বলতে চাই তা তোমার বিশ্বাসই হবে না যদি না একটা গল্প তোমাকে বলি। এখানে মখমলের মতো ঘাস হয়, নিবিড় গাছপালা আর কত ছড়ানো এখানকার নির্জনতা। আমার বাড়ির কাছেই একটা বন। এখানে সবই অভয় অরণ্য। এরা গাছপালা এত ভালবাসে। রোজ সকালে আমি একা একা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে যাই। একটা নদী আছে, কেউ সেখানে কখনও স্নান করে না। একটা মল আছে। মল মানে জানোই তো, বাঁধানো চাতাল আর বসবার জায়গা। এরা যা করে নিখুঁত। মলটাও এত সুন্দর। রোজ গিয়ে নদীর ধারে ওই মল-এ বসে থাকি। কেউ থাকে না। মাঝে মাঝে ঘোড়া চালায় ছেলেমেয়েরা। আর জগাররা দৌড়োয়। এদের খুব স্বাস্থ্যের বাতিক। বহুদিন বাঁচতে চায়, খুব ভোগ করতে চায়। একদিন কী হল জানো, খুব সকালে বেরিয়েছি। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছি। সেপ্টেম্বর মাস। ফল-এর আর দেরি নেই। গাছের পাতার রং বদলে যাচ্ছে। ক'দিন পর সারা বনভূমি একদম রাঙা হয়ে যাবে। ফল যদি তুমি দেখতে! ইচ্ছে করছে আমার দুখানা চোখ তোমাকে পাঠিয়ে দিই। আমি চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটছি। হঠাৎ পায়ে কী একটা ঠেকল। শক্ত। তাকিয়ে যা দেখলাম বুক হিম হয়ে গেল। একটা পিস্তল পড়ে আছে। কোথা থেকে এল? কে ফেলে গেল? সর্বনাশ! ধারেকাছে ষণ্ডাগুণ্ডা রেপিস্ট নেই তো! না বাবা, ফিরে যাওয়াই ভাল। শরীর কেঁপে-টেঁপে আমার কী অবস্থা! ফিরব বলে যে-ই ঘুরে দাঁড়িয়েছি কী দেখলাম জানো? ভাবতেও পারবে না রাস্তার ধারে একটা পুরনো গাছ গত ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। কেউ সরায়নি। সেই শুকনো গাছের ওপর একটা হাত নেতিয়ে পড়ে আছে। সাদা হাত। আমার কী অবস্থা ভাবতে পারো? বুক ধড়ফড় করে যাই আর কী! তবু কী জানো, খুব ভয়ের

মধ্যেও একটু সাহস ছিল। সকালবেলা, দিনের আলো, কাছাকাছি জগার আর রাইডাররা তো আছেই। আমি পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে উঁকি দিয়ে বললাম, হু ইজ দ্যাট ?

কেউ জবাব দিল না। দেখলাম একটা লোক কাত হয়ে পড়ে আছে। কপালের পাশটায় একটা ফুটো। অনেক রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। তারপর জমে গেছে। ভয় পেলেও আমি তো ডাক্তার। গাছের ওপর নেতিয়ে পড়া হাতটা ধরে বুঝলাম মারা গেছে অনেকক্ষণ। রিগর মরটিস শুরু হয়ে গেছে। বেশি বয়স নয়। সাতাশ-আঠাশ। একমাথা সোনালি চুল। সাদা একটা শার্ট আর ট্রাউজার্স পরা। আর মুখখানা এত কচি, এত সুন্দর কী বলব। কী হল জানো, হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল। কেন মনে পড়ল বলো তো ! ছেলেটার মুখখানায় তোমার আদল আসে। আর সেই যে মনে পড়ল, হঠাৎ যেন হু হু করে তুমি সাত সমুদ্দুর ডিঙিয়ে এসে আমার ভিতরে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ছিলে। ভিতরটা তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এত কান্না পাচ্ছিল কেন বলো তো !

আমি মলের দিকে দৌড়োতে লাগলাম। চিৎকার করলাম। লোকজন জড়ো হল। পুলিশ এসে ডেডবডি তুলে নিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এলাম কেমন যেন ভূতে-পাওয়ার মতো। বসে বসে ভাবলাম আর ভাবলাম। একটা বহুকালের বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে যেন এক আশ্চর্য বাগানে পা দিয়েছি। চারদিক ফুলে ফুলে রঙে গন্ধে একাকার। কিন্তু কেন ?

তুমি বিশ্বাসই করবে না তিন দিন আমার মাথা এলোমেলো রইল। কাজে মন দিতে পারিনি। বারবার কী মনে পড়ছিল বলো তো ! ফুলশয্যার রাতে তুমি কোনও কথা বলার আগেই আমাকে একটা অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেয়েছিলে। অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতেই দাওনি। এমনভাবে ধরেছিলে আমায় যে, নড়তেও পারিনি। আমার খুব রাগ হচ্ছিল তোমার ওপর। তোমাকে ভাল তো বাসিই না, বরং ঘেন্না করি।

ভীষণ। কী ভয়ঙ্কর রাগ হচ্ছিল আমার। তুমি যখন ছাড়লে তখন আমি কী না বলেছি! যা খুশি। তোমার মুখটা কেমন নিভে গেল। কেমন ঠাণ্ডা আর পাথরের মতো হয়ে গেলে তুমি!

এবার গল্পটা আর একটু বলে নিই। জঙ্গলের মধ্যে যে-ছেলেটা সুইসাইড করেছিল তার নাম জর্জ। এখানে, হাজার হাজার জর্জ। যা হোক, এই জর্জ কেন সুইসাইড করল বলো তো! বললে তোমার বিশ্বাস হবে না।

আমি জর্জকে চিনতাম না বটে, কিন্তু তার বাড়ি আমার খুব কাছাকাছি। পুলিশের কাছে শুনলাম, জর্জের নতুন বউ তাকে ছেড়ে চলে যাওয়াতেই নাকি সে আত্মহত্যা করে বসেছে। শোনো কথা, এ দেশেও এরকম হয় নাকি? এখানে তো বর-বউ সম্পর্কই অন্যরকম। ছাড়ছে, ধরছে। বিয়েও করছে না সবসময়ে। এত নিরাবেগ জাত, তবুও তো মাঝে মাঝে এরকম হয়! শুনে মনটা আরও আরও খারাপ হল। আর কী জানো, যত মন খারাপ ততই যেন সেই মন-খারাপটা আমি এনজয় করছিলাম। এটা একটা বিশ্বাস করার মতো কথাই নয়। মন-খারাপ কি কেউ এনজয় করে? কিন্তু আমি যে করছিলাম!

সেই মন-খারাপের মধ্যে কী হল বলো তো! আমার ভিতরে যেন বাইরের মতোই পাতা ঝরার সময় হল। কী যে ছাই হল মাথামুণ্ডু বুঝতেও পারি না, বোঝাতেও পারি না। যখন বিয়ে হয়েছিল তখন কী-ই বা বয়স বলো! আর বাবা জোর করে বিয়ে দিয়েছিল বলে সেই বয়সে কী রাগ হয়েছিল আমার! রাগ ছিল পাণ্টুর জন্যও। ওই বদমাশটার জন্য কেন বলো তো চিরকালের একটা দাগ পড়ল জীবনে! সব মিলিয়ে মিশিয়ে বিয়ের সময়ে আমার মধ্যে আমি তো ছিলাম না। বাবার ক্যান্সার হয়েছে বলে শুনছি তখন, মাথাটাই খারাপ হওয়ার জোগাড়। সব রাগ গিয়ে পড়ল বেচারা তোমার ওপর! সেসব আমার পুরনো পাতা। এই পাতা ঝরার দিনে সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এলে ঝোড়ো বাতাসের মতো তুমি।

আমার পাতা খসে পড়ল সব। এক সন্ধেবেলা ঘর অন্ধকার করে বসে আছি। বাইরে নির্জন রাস্তা। তার ওপাশে ছবির মতো বাড়ি। তার পিছনে অন্ধকার বনভূমি। চেয়ে আছি। আকাশে মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কী মনে হল বলব? হঠাৎ মনে পড়ল, সেই যে অনেকক্ষণ ধরে তুমি আমাকে চুমু খেয়েছিলে, তখন বুঝতে পারিনি, রাগ হচ্ছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব গভীর কোথাও সেই চুমুর স্মৃতি সুখের মতো শিহরন নিয়ে আজও আছে। খুব রাগ করেছিলাম তোমার ওপর। আলাদা ঘরে থাকতাম। তুমি কি জানো, মাঝে মাঝে দরজাটা চুলের মতো ফাঁক করে লক্ষ করতাম তোমাকে? তুমি আমাকে আক্রমণ করতে চাও কি না, তুমি জোর জবরদস্তি করবে কি না, তা বুঝতে চেষ্টা করতাম। ভয় পেতাম, তুমি হয়তো ধর্ষণ করবে আমায়। আজ মনে হয়, আমি বোধহয় তাই চাইতাম। কেন জোর করলে না বলো তো! আজ খুব বুঝতে পারছি, সে সময়ে আমার মধ্যে দুটো উল্টো জিনিস কাজ করছিল। একই সঙ্গে একটা টান আর একটা প্রত্যাখ্যান। তখনকার বয়সটার কথা ভাবো, আমার জীবনটার কথা ভাবো, বুঝতে পারবে।

কিন্তু এখন এই দূর দেশে বসে এই নতুন নিজেকে আবিষ্কার করে কী হবে বলো তো! সব তো চুকে-বুকে গেছে। সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলেছি। একটা কথা বললে বিশ্বাস করবে? তোমাকে প্রথম দেখেই কিন্তু মনে হয়েছিল, তুমি একটা ভাল লোক। কেন বলো তো! তুমি কি সত্যিই ভাল? কে জানে! কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই, সেই জঙ্গলের মধ্যে ঘটনাটার পর থেকে আমার সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। কতবার ভুল করব বলো তো জীবনে? আমার কিছু ভাল লাগছে না।

(দুই) তোমাকে আমার খুব লম্বা একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে। তাতে অনেক আবোল তাবোল থাকবে। যা খুশি লিখব। পাগলামিতে ভরা। জানো গো, আমার কিন্তু একটু একটু করে পাগলামিই দেখা দিচ্ছে বোধহয়। হঠাৎ হঠাৎ

আমার আজকাল এত আনন্দ হয় যেন আমি বর্ষার নদী, দু'কূল ছাপিয়ে কোথা থেকে কোথায় ছড়িয়ে পড়ছি। আবার অকারণেই বুক ভার, চোখে জল, মন মেঘলা। পড়াশুনোর এত চাপ, এত ভীষণ সময়ের অভাব, তবু তার মধ্যেও এসব হয়। জানো না তো, এখানে কাজের চাপে মনের সব আবেগ শুকিয়ে যায়। ছিলাম এক বাঙালি দম্পতির বাড়িতে। তারা বেশ লোক। বুড়োবুড়ি। দুই মেয়ের এদেশেই বিয়ে হয়েছে। বুড়োবুড়ির সময় কাটে আপনমনে, ঘোর নিঃসঙ্গতায়। আমি তাদের মাসিমা মেসোমশাই ডাকতাম। তারা তাতে খুব খুশি। ও-বাড়িতে বেশ ছিলাম। কিন্তু এখন হোস্টেলে থাকতে হচ্ছে। বড্ড কেজো জায়গা। যে যার নিজের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত।

আমারও ইগো, তোমারও ইগো। তাই তোমাকে চিঠিটা লিখতে গিয়েও লিখতে পারিনি। তিনবার কিন্তু শুরু করেছি। তিনটে এয়ারোগ্রাম নষ্ট। না, ফেলিনি, রেখে দিয়েছি। কী জানি, তুমি বিয়ে করেছ কি না। মাঝে মাঝে তোমার খবর খুব জানতে ইচ্ছে করে। করেছ? সমীরণ প্রায়ই চিঠি লেখে, আমিও লিখি। কিন্তু তার কাছে জানতে চাইতে লজ্জা করে। কী ভাববে? আচ্ছা, টেলিপ্যাথি বলে কিছু নেই? নেই কেন? এই তো আমি টেলিপ্যাথিতে তোমার কাছে কত কথা বলছি! শুনতে পাচ্ছ?

প্রফেসর এজেফিয়েল সেদিন বলছিলেন, যাদের ইগো খুব প্রবল তাদের মধ্যে পাগলামির লক্ষণ থাকে। এই ইগো বড্ড জ্বালাচ্ছে আমাকে, জানো? তাই তোমাকে চিঠি লিখতে পারছি না। এটা আমার পাগলামি নম্বর এক। দু' নম্বর পাগলামি হল, এখন তোমাকেই ভাবি আর তোমার সঙ্গেই কথা বলি মনে মনে। এটাকে কি ভাবমূর্তি বলে? না বোধহয়। অন্য কিছু বলে হয়তো। কিন্তু ভাবমূর্তি কথাটা বেশ, না? তোমাকে ভেঙে ফেললাম, তারপর তোমার একটা মানসমূর্তি গড়ে নিলাম, বেশ মজা।

সেদিন একটা কাণ্ড হল। সুসান আমার খুব বন্ধু। দুজনে

গাড়ি নিয়ে একটা ঝরনা দেখতে গেছি। বড্ড সুন্দর জায়গা। সাফোকেটিংলি বিউটিফুল। ফেরার সময় একটা পিছল জায়গায় আছাড় খেলাম। না, তেমন লাগেনি। কিন্তু কে জানে কেন, আমার চোখ ভরে জল এল। ভাবলাম, তুমি থাকলে আমি কি পড়ে যেতাম? কক্ষনো না। সুসান আমাকে ধরে তুলছিল। চোখে জল দেখে অবাক হয়ে বলল, আর ইউ ক্রায়িং? মাই গড, ইউ আর নট দ্যাট হার্ট!

আমি অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বললাম, আমার তো কেউ নেই!

কী কথার কী উত্তর। শুনে সুসান আরও অবাক। বলল, আরে তোমার আবার কে থাকবে? আমারই বা কে আছে? উই ডোন্ট নিড এনিবডি।

সত্যিই তাই। এদের কেউ নেই। মা বাবা ভাই বোন কারও তোয়াক্কা করে না। একা থাকে, স্বয়ংসম্পূর্ণ। দরকার মতো বিছানায় বয়ফ্রেন্ড ডেকে নেয়। তারপর তাকে ভুলেও যায়। জলভাত। আর বিয়ে করতে হলে এত হিসেব নিকেশ করতে বসে যে, ওটা বিয়ে না বিজনেস কন্ট্রাক্ট তা বুঝতে কষ্ট হয়।

আমি এদের কাছে পাঠ নেওয়ার চেষ্টা করছি। পারছি না। কিছুতেই পারছি না। আমার কেবলই মনে পড়ে সেই তোমার অনেকক্ষণ ধরে চুমু খাওয়ার কথা। তখন ঘেন্না করেছিল। আজ আমার সমস্ত শরীর আর মন সেই চুমুটার কথা ভেবে সম্মোহিত হয়ে যায়। অন্য কোনও পুরুষ কাছে এলে কুঁকড়ে যাই, স্পর্শ তো বটেই, কাছাকাছি হওয়াটাও সহ্য করতে পারি না। এ আমার পাগলামি নম্বর তিন।

(তিন) আজ বাবা এল। এয়ারপোর্টে বাবাকে আনতে গিয়েছিলাম। দেখলাম অল্প কিছুদিনেই বাবা বড্ড বুড়িয়ে গেছে। এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছি, টুকটাক কথা হচ্ছে। কী করলাম জানো? হঠাৎ বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, মিঠুবাবুর কী খবর?

বাবা অবাক হয়ে বলল, মিঠুবাবু কে?

আমি ভ্রূ কুঁচকে বললাম, মিঠু মিত্র।

কী হবে খবর দিয়ে?

এমনি।

আমার বুক কাঁপছিল। লজ্জা করছিল।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কদিন আগে দেখা হয়েছিল। ভাল আছে।

আমি আরও কিছু শুনতে চেয়েছিলাম। বাবা বলল না।

কিন্তু দু' দিন পর এক রাতে ডিনারের পর বাবা আমাকে ডেকে বলল, হ্যাঁ রে, তুই সেদিন মিঠুর খবর জানতে চাইলি কেন?

এমনি।

তোর কি মিঠুর কথা মনে হয়?

আমার চোখে ফের জল এল। বাবার কাছ থেকে পালিয়ে এলাম।

পাশ করে চাকরি পেয়ে হোস্টেল ছেড়ে বাসা করেছি। ভাড়া অবশ্য। শিগগিরই একটা বাড়ি কিনব। একা থাকব। চাকরি করব। আর এভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দেব প্রবাসে—আমার নিয়তি তো এই।

কয়েকদিন পর বাবাকে নিউ ইয়র্ক দেখাতে নিয়ে গেছি। কিন্তু বাবার তেমন বিস্ময় নেই। কী যেন ভাবছে। মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামে রেস্টুরেন্টে চা খেতে খেতে বাবা হঠাৎ বলল, এসব দেশে একটা মেয়ের পক্ষে একা থাকা বিপজ্জনক।

কত মেয়েই তো আছে। এদেশে একা থাকাই রেওয়াজ।

সেটা কেমনতরো কথা! একা থাকার রেওয়াজ তাদের কাছে, যারা নিরুপায়।

আমিও তো তাই।

তুই কেন নিরুপায়?

এ কথার কি জবাব হয়? চুপ করে রইলাম।

(চার) বাবাকে আজ প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম। প্রায় এক

বছর আমার কাছে রইল বাবা। কী যে ভাল লাগত। আর কিছু নয়, বাড়ি ফিরে একজন আপন মানুষকে তো দেখতে পেতাম ! এ দেশের একাকিত্ব তুমি ভাবতেও পারবে না। পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে মাখামাখি করা যায় না, আড্ডা নেই, হুটহাট কারও বাড়ি যাওয়া যায় না। চেনাজানা লোকদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে বলে আর কত সময় কাটে ? সময়ও হাতে কম। উদয়াস্ত হাসপাতাল, রুগি, রিসার্চ।

গতকাল বাবা বলছিল, একটু ভেবে বল, দেশে কাউকে তোর কোনও মেসেজ দেওয়ার আছে ?

মাথা নেড়ে বললাম, না বাবা।

মিঠু বোধহয় এখনও তোকে ফেলবে না।

আমি তো তার দয়া চাই না।

তোর যে কেউ নেই।

তুমি তো আছ।

আমি আর কদিন ? আমার ইচ্ছে মিঠুর সঙ্গে বিয়েটা মেনে নে। সে বরং এখানে চলে আসুক।

থাক বাবা। সে নিশ্চয়ই আমাকে ঘেন্না করে।

রাগ তো থাকতেই পারে। কিন্তু সে বুদ্ধিমান, বিবেচক ছেলে।

থাক বাবা।

মুখে যাই বলি, বুকটা কেমন করছিল, এমন কি হয় ? এমন কি হতে পারে ? হলে হয়তো ভালও হবে না। কল্পনা এক, বাস্তব আর এক। মিলবে না হয়তো।

উজ্জ্বল অ্যাপ্রোচ করছে। বারবার। জানি, এটা সম্ভব নয়। তবু উজ্জ্বল যে আসছে তা মেনেও নিই। আর কিছু নয়। এই সাঙ্ঘাতিক একাকিত্ব থেকে তো খানিকটা মুক্তি। একজন কথা বলার লোক।

মোট বারোটা এয়ারোগ্রাম জমা হয়েছে। ওপরে তোমার নাম আর ঠিকানা। ভিতরে তিন বা চার লাইন লেখা। সবচেয়ে বড়টায় লিখতে পেরেছি তেরো লাইন। পছন্দ হচ্ছে না।

বাবা চলে যাওয়ার পর খুব কাঁদলাম। অনেকক্ষণ ধরে। আমার যে কী হবে।

তিনটে জেরক্স কপির দিকে চিন্তিত মুখে চেয়ে ছিল শবর দাশগুপ্ত। মিতালির ডায়েরিতে এই তিনটে পাতাই পাওয়া গেছে। বাদবাকি পৃষ্ঠা সাদা। লেখাগুলোর ওপরে বা নীচে কোনও তারিখ নেই। অনুমান করা যায় প্রথমটা আর শেষটার মধ্যে সময়ের তফাত দুই বা তিন বছরের। এর মধ্যে আরও অনেক পৃষ্ঠা লেখা হয়েছিল নিশ্চয়ই। সেগুলো কোথায় গেল বোঝা যাচ্ছে না।

কেসটা খুব মাখো মাখো হয়ে উঠছে স্যার। এ তো রীতিমতো লাভ অ্যাফেয়ার!

শবর তার বিচ্ছু টাইপের সহকারী নন্দলালের দিকে চেয়ে বলল, হাতের লেখা চেক করেছ?

হ্যাঁ। ওসব ঠিক আছে। মিতালিরই হাতের লেখা। শেষ টুকরোটায় উজ্জ্বল সেনের রেফারেন্সটা দেখেছেন স্যার?

দেখেছি। পাণ্টুর কী খবর?

বাড়ি নেই। ধানবাদ না কোথায় কোন ধান্দায় গেছে। আজ বা কাল ফিরবে। ফিরলেই তুলে নেব।

ক্ষণিকা দেবীকে চেক করো।

ও.কে.।

আর কোনও ডায়েরি খুঁজে পাওনি?

না স্যার। এই একটাই। মোট তিনটে এন্ট্রি। কোনও পাতা ছেঁড়া ছিল না।

কিন্তু বোঝা যাচ্ছে মিতালি দেবী সিস্টেমেটিক ছিলেন না। উনি এক একসময়ে এক একটা ডায়েরিতে লিখতেন। বাকি ডায়েরিগুলো হয় উনি আমেরিকা থেকে আনেননি, নয়তো চুরি গেছে।

মিঠু মিত্রকে কি তোলা হবে স্যার?

এখন নয়। তুমি বাড়িটা আর একবার সার্চ করো।

দেখো, যদি সিগনিফিক্যান্ট কিছু পাও।

নন্দলাল চলে গেল। শবর চিন্তিত মুখে চেয়ার টেনে বসল। এইটেই মিতালির শোয়ার ঘর। দক্ষিণ পশ্চিম এবং পুব খোলা। দেয়ালে হালকা ক্রিম রং। আসবাব সবই খুব উঁচু জাতের। বার্মা সেগুনের ডবল খাট, বড় ওয়ার্ডরোব, হাফ সেক্রেটারিয়েট এবং রিভলভিং চেয়ার, কাশ্মীরি কাজ করা ছোট টেবিল, ওয়াল ক্যাবিনেটে নানা দামি জিনিস সাজানো। হাতির দাঁতের মূর্তি, রুপোর ওপর মিনার কাজ করা রেকাবি, পুতুল, দুটো মজবুত স্টিলের আলমারি। সবই খুলে দেখা হয়েছে।

খাটের কাছ বরাবর মেঝেতে পড়ে ছিল মিতালি। মোট দুবার তাকে ছুরি মারা হয়েছিল। পিঠের দিক থেকে, হৃৎপিণ্ড বরাবর। মিতালি পড়ে ছিল কাত হয়ে, বাঁ দিকে। চারদিকে অন্তত বারো-তেরোটা সেন্টের শিশি ভাঙা অবস্থায় ছড়িয়ে ছিল। ঘর সুগন্ধে এত ভরা ছিল যে পুলিশ কুকুর সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। স্নিকার ডগকে বিভ্রান্ত করার জন্যই যে সেন্টের শিশিগুলো ভাঙা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। একজন কেয়ারটেকার, একজন রান্নার লোক এবং একটি কাজের মেয়ে কোনও নতুন কথা বলতে পারেনি। ককটেল ডিনারে ডিনার সার্ভ করেছিল এক নামী ক্যাটারার। তাদের কাছ থেকেও পাওয়া যায়নি তেমন কোনও সূত্র। মোটামুটি যা জানা গেছে তা হল, রাত এগারোটা নাগাদ মিতালি সামান্য মাতাল অবস্থায় ওপরে উঠে আসে। দোতলায় সে একা থাকত। সে শোয়ার ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর মধ্য রাতে রান্নার লোক হরেন আর মালি ভজুয়া অনেক শিশি বোতল ভাঙার আওয়াজ পায়। মিতালি মাতাল অবস্থায় ওসব করছে ভেবে ওপরে ওঠেনি ভয়ে।

শবর উঠল। খানিকক্ষণ পায়চারি করল। তারপর পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। খুন করে পালিয়ে যাওয়ার পক্ষে এই বারান্দাটি প্রশস্ত। পিছনে একটু বাগান এবং ঝোপঝাড় আছে। বারান্দা থেকে অনায়াসে নীচের ঘরের

জানালার ওপরকার রেন শেড-এ নামা যায়। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়লেই হল।

না, শবর দাশগুপ্ত খুশি হচ্ছে না। মোটিভ অ্যাঙ্গেলটা পাল্টে যাচ্ছে। কোথাও একটা নট রয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে সে আবার নতুন করে পূর্বাপর ভাবতে লাগল।

নমস্কার মিত্তিরমশাই। আপনাকে আবার জ্বালাতে এলাম।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারার মিঠু দরজাটা ছেড়ে দিয়ে ভদ্র গলায় বলল, আসুন।

আপনি তো বেশ ভেঙে পড়েছেন দেখছি।

ও কিছু নয়। বসুন।

আমাদের আরও কিছু জানার আছে মিত্তিরমশাই। উই ওয়ান্ট ইওর হেল্‌প্‌।

বলুন।

আপনি সে দিন মিতালি দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আপনাদের মধ্যে কথাও হয়েছিল। আমি সেই কথাগুলো জানতে চাই।

প্রথম স্টেটমেন্টেই বলেছি।

জানি। তবু আর একবার বলুন।

মিঠু মাথা নেড়ে বলল, ওর বেশি আমার কিছুই বলার নেই।

মিতালি দেবীই কি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

মিঠু ক্লান্ত চোখে চেয়ে বলল, একটা যোগাযোগ হয়েছিল।

কীরকম যোগাযোগ? আপনার তো টেলিফোন নেই। তাহলে?

আমার অফিসে টেলিফোন আছে।

ওঃ হ্যাঁ, ও কথাটা মনে ছিল না। তাহলে মিতালি দেবী আপনাকে অফিসেই টেলিফোন করেছিলেন?

আমি সে কথা বলিনি।

যোগাযোগটা কবে হয়েছিল ?

ঠিক মনে নেই।

মারা যাওয়ার দিন কি ?

না।

না ? তার মানে আপনার মনে আছে। ব্যাপারটা আপনি চেপে যেতে চাইছেন কেন ?

কিন্তু কথা না বলার অধিকার আমার আছে।

কিন্তু তাতে একটা মার্ডার কেস ক্ষতিগ্রস্ত হলে নয়।

আমি যে কথা বলতে চাইছি না তার সঙ্গে ওর খুনের সম্পর্ক নেই।

আপনি কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে মিতালি দেবীর বাড়িতে যান ?

না। হঠাৎ গিয়েছিলাম।

কিন্তু একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনাদের মধ্যে হয়েছিল ?

সেভাবে নয়।

মিতালি দেবী দেশে এসেছেন তাঁর বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে। প্রায় এক মাস আগে। এর মধ্যে তাঁর সঙ্গে আপনার মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল কি ?

হ্যাঁ।

ইউ আর নট এ গুড লায়ার। প্লিজ, সত্যি কথা বলুন। তাতে আমাদের তদন্তের সুবিধে হবে।

কিছু কথা আমি বলতে বাধ্য নই।

আপনি কি জানেন পৃথিবীতে যেখানে যত বিবাহিতা মহিলা খুন হন তাঁদের অধিকাংশের খুনের পিছনেই থাকেন তাঁদের হাজব্যান্ডরা। শতকরা নব্বইটা কেসেই।

জানি।

জানেন কি যে, এই কেসেও আপনি প্রাইম সাসপেক্ট ?

অনুমান করছি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।

ইউ আর এ কুল কাস্টমার।

মিঠু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কিছু বলল না।

মিঠুবাবু, আপনার পাসপোর্টটা একটু দেখাতে পারেন ?

পাসপোর্ট ! আমার পাসপোর্ট নেই।

সে কী ! পাসপোর্ট করেননি ?

না। আমার দরকার পড়েনি।

এই জেরক্স কপিগুলোর হাতের লেখা চিনতে পারেন ?

পারি। মিতালির লেখা।

মিতালির লেখা বলে চিনলেন কী করে ?

বলতে পারব না। চিনি।

এ হাতের লেখা কোথায় দেখেছেন ? চিঠি বা ডায়েরিতে ?

মনে নেই।

তিনি কি আপনাকে চিঠি লিখতেন ?

না।

আপনি ডায়েরির এই তিনটে কপি একটু পড়ে দেখুন।

মিঠু কপিগুলো হাতে নিল। পড়তে লাগল। তার মুখের দিকে ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দুটি চোখ নিষ্পলক নিবদ্ধ রইল সারাক্ষণ। মিঠুর মুখে তেমন কোনও ভাবান্তর হল না। পড়া শেষ করে সে একটা শ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে বসে রইল।

মিঠুবাবু, আমি ক্রাইমের লোক, হৃদয়ের ব্যাপারটা ভাল বুঝি না। এ ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই অবাক ঠেকছে। আপনি কি ব্যাখ্যা করতে পারেন ?

না। আপনার কি মনে হয় এগুলো ফলস এবং ফ্রড ? কেউ মিতালির হাতের লেখা নকল করে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে ?

হতে পারে।

আর যদি তা না হয়, যদি সত্যিই মিতালি দেবীরই লেখা হয় তাহলে বুঝতে হবে তিনি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন।

মিঠু জবাব দিল না।

হাবুডুবুই যখন খাচ্ছিলেন তখন তাঁর পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক হল, দেশে ফিরেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা।

তাই না ?

নাও হতে পারে।

সেটা কীরকম ?

অনেকে আছে, মনে মনে অনেক কিছু বানিয়ে নেয়, বাস্তবকে এড়িয়ে চলে।

মিতালি কি সাইকিয়াট্রিক কেস ?

আমি জানি না।

আপনি এম সেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট্সের নাম কখনও শুনেছেন ?

খুব সূক্ষ্মভাবে একটু শক্ত হয়ে গেল কিনা মিঠু, তা ভাল বুঝতে পারল না শবর। একবার চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে মাথা নিচু করল। বলল, কেন ?

আহা, শুনেছেন কি না বলুন না।

শুনতেও পারি।

শুনেছেন মশাই, শুনেছেন। কলকাতার পুরনো অ্যাটর্নি। আপনার শ্বশুর এঁদের মক্কেল ছিলেন।

ও।

আপনি কি জানেন এঁদের কাছে মিতালি দেবীর একটা ডিড আছে ?

থাকতে পারে।

অত নির্বিকার থাকবেন না। ডিডটা আপনার নামে করা। মিতালি দেবী তাঁর সব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনাকে দিয়ে গেছেন। আপনি এখন এক বিশাল সম্পত্তির মালিক। তাই না ?

কাস্টোডিয়ান আর মালিক তো এক কথা নয়।

ডিডটা কি আপনি দেখেছেন ? মিতালি দেবীর কলকাতার যাবতীয় সম্পত্তি দেখাশুনো, প্রয়োজনে বিক্রি করা বা যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়েছে।

পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি একটা সাধারণ জিনিস।

খুব সাধারণ কি ? তাছাড়া মিতালি দেবীর সিঙ্গল ব্যাঙ্ক

অ্যাকাউন্টকে সম্প্রতি জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে। আপনার সঙ্গে। এটাও স্বাভাবিক ?

মিঠু একটা শ্বাস ফেলে বলল, কলকাতায় ওদের বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনো করার কেউ নেই। ফলে—

ফলে উনি ওঁর ডিভোর্স করা স্বামীকে পরম বিশ্বাসে সব কিছুর ভার দিয়ে ফেললেন ?

মিঠু চুপ্।

মোটিভটা উনিই তৈরি করেছিলেন। মিতালি দেবীর সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল আপনাকে এতটা বিশ্বাস করা। সব কিছু যেই হাতের মুঠোয় এল·অমনি নিষ্কন্টক হওয়ার জন্য আপনি তাঁকে নির্মমভাবে সরিয়ে দিলেন !

কাজটা আমি করিনি।

নিজের হাতে করেননি বলছেন ? তাহলে কি ভাড়াটে খুনি অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন ?

মিতালিকে খুন করার কোনও কারণ আমার ছিল না।

এগুলো কি কারণ নয় ?

আমার কাছে নয়।

তাহলে আপনার সুবিধের জন্য আমি ঘটনাগুলো একটু সাজিয়ে দিই ? শ্রীমতী মিতালি ঘোষ একদিন আমেরিকায় একটি ঘটনা থেকে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, তিনি আপনাকে আকণ্ঠ ভালবাসেন। সেই হৃদ্দমুদ্দ ভালবাসায় এই রোমান্টিক ও একটু ইমপ্র্যাকটিক্যাল মহিলা ডায়েরিতে পাতার পর পাতা নিজের হৃদয়াবেগে ভরে ফেলতে লাগলেন। অথচ ইগো এবং লোকলজ্জায় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারলেন না। দেশে ফিরে এসে বরুণ ঘোষ কিছুদিন পর মারা গেলেন। মিতালি দেবী সেই মৃত্যু উপলক্ষে দেশে ফিরলেন। তিনি তখন সম্পূর্ণ একা। এই অবস্থায় তিনি আকুল হয়ে লজ্জা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে প্রথমেই ছুটে এলেন আপনার কাছে। হয়তো আত্মসমর্পণও করলেন। এই গ্যাপগুলো যদি আপনি ভরাট করতে পারতেন তাহলে আমাদের পক্ষে সুবিধে হত। যাকগে, যা বলছিলাম। উনি

তো আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, কিন্তু আপনি তো খাচ্ছিলেন না। আপনার বুকে দীর্ঘকালের একটি অপমান বিষধর সাপের মতো অপেক্ষা করছিল। আপনার জন্মমাস নভেম্বর, আপনি একজন স্কোর্পিও। স্কোর্পিওর জাতকদের প্রতিশোধস্পৃহা হয় সাংঘাতিক। তার ওপর আপনি লোভী, সম্পত্তির লোভেই না আপনি মিতালি ঘোষের অতীতের কলঙ্কের কথা এবং বিয়েতে তাঁর অনিচ্ছা জেনেও তাঁকে বিয়ে করেন। হয়তো বিয়ের পর তাঁর সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু থ্যাংক গড, মিতালি দেবী সময় থাকতেই আপনাকে ডিভোর্স করে আমেরিকায় চলে যান। আপনার কপালটা কিন্তু দারুণ ভাল। মিতালি দেবী সম্মোহিতের মতো ফিরে এসে আপনার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করলেন। এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কী হতে পারে বলুন! তার ওপর আপনি একজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। নিষ্ঠুর ও আবেগহীন। এ কুল কাস্টমার। আপনি মিতালির তালে তালে একটু নাচলেন। তাঁর সম্পত্তির কাস্টোডিয়ান হলেন, জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের কয়েক লাখ টাকা আপনার নাগালের মধ্যে এসে গেল। এরপর মিতালি দেবীর মতো একজন আবেগসর্বস্ব, ছিটিয়াল মহিলাকে জীইয়ে রাখার কোনও কারণ আপনার ছিল না। তাই না ? নিজেই হোক বা ভাড়াটে লোক দিয়েই হোক আপনি তাকে সরিয়ে দিলেন। বাই দি বাই, খুনের দিন রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন বলুন তো !

॥ চার ॥

একজন লোক সকালবেলায় একরকম, দুপুরে অন্যরকম, বিকেলে একেবারে আরও অন্যরকম। ধরা যাক লোকটার নাম রমেন বা শ্যামলী। সকালের রমেন বা শ্যামলী বেশ নরম সরম, উদারচেতা, হাস্যমুখ। দুপুরের রমেন বা শ্যামলী নানা উদ্বেগ ও চাপে তিরিক্ষি, রগচটা, মারমুখি এবং কঞ্জুষ।

বিকেলের রমেন বা শ্যামলী ক্লান্ত, উদ্দেশ্যহীন, হতাশ, পর্যুদস্ত। এই যে একজনেরই নানা প্রকাশ বা স্ফূরণ এটা ধরতে পারাই হচ্ছে চূড়ান্ত বিচক্ষণতা। রমেন বা শ্যামলীর মধ্যেও তফাত আছে। রমেন হয়তো সকালে তিরিক্ষি বিকেলে নরম, শ্যামলী তার উল্টো। একজন মানুষ নানা অবস্থা, নানা পরিস্থিতি, নানা চাপ, নানা উদ্বেগ ও ব্যস্ততায় অন্য অন্য সব মানুষ হয়ে যায়। সকালের রমেনকে দুপুরে দেখলে রমেন বলে মনেই হবে না। দুপুরের শ্যামলীকে যদি মনে হয় বনলতা সেন, রাতে তাকেই মনে হতে পারে বান্ধবগড় জঙ্গলের ভালুক বলে। জীবন তো এরকমই। রবীন্দ্রনাথ তো বলেই দিয়েছেন, তাঁর জীবনটা হল নানা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গাঁথা একখানা মালা। হোয়াট অ্যান এক্সপ্রেশন ! লা জবাব।

এই যে সমীরণের মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সুগভীর গবেষণালব্ধ জ্ঞান, আজ সেই জ্ঞানটাকেই হাতিয়ার করে এগোতে হবে। শ্রীরাধিকার অভিসারে যাওয়ার মতোই। পথ দুর্গম, ক্ষুরস্য ধারা, ফণী ফোঁস ফোঁস করছে, পিছলে পড়ে আলুর দম হওয়ার চান্স আছে। তবু রাধা যেমন রোজই কুঞ্জে পৌঁছে যেত, সেও পৌঁছে যাবে।

রিস্কটা নেওয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু গতকাল জুলেখা বলেছে আজ রাত থেকে থাকতে পারবে না। তার হাজব্যান্ড বাঙ্গালোর থেকে ফিরে আসছে। এই নতুন খবরে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে সমীরণ বলল, তুমি তো বিয়েই করোনি !

মৃদু হেসে জুলেখা বলল, ওরকম বলতে হয়।

কোনটা সত্যি বলো তো। আগে যেটা বলেছিলে, না এখন যেটা বলছ !

যে কোনও একটা। বাট আই অ্যাম লিভিং।

এ খবরে মাথায় বজ্রাঘাত হল তার। সে পাপী। আর কে না জানে, পাপীদের জন্যই পৃথিবীতে যত ভয়-ভীতির আয়োজন। নেশা করলে সে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখতে পায়। একা ফ্ল্যাটে তার পক্ষে থাকা অসম্ভব।

ক্ষণিকাকে ফিরিয়ে না এনে আর উপায় নেই।

তবে হিউম্যান নেচার সম্পর্কে তার জ্ঞান গভীর বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস। সকালের দিকে ক্ষণিকার মেজাজ ভাল থাকে। এ সময়টায় সে হাসে, ঠাট্টা ইয়ার্কি বুঝতে পারে, বেশ দয়ালু হয়ে ওঠে তার চোখের দৃষ্টি। ফুল অফ হিউম্যান কাইন্ডনেস। তার হৃদয়ের বালতি তখন উপচে পড়ে দয়া-দুগ্ধে।

তাই আজ সকালে— অর্থাৎ বেলা সাড়ে আটটায়—সে অত্যন্ত মলিন মুখে এসে বসে আছে ক্ষণিকার বাপের বাড়ির বাইরের ঘরে। সে দাড়ি কামায়নি, পরিষ্কার জামা কাপড় পরেনি এবং মুখে হাসি নেই। ডোরবেল বাজানোর পর ঝি এসে দরজা খুলে বসিয়ে রেখে গেছে। ফাঁকা ঘর। সোফাসেট, বুক কেস, কাশ্মীরি কাঠের পার্টিশন দিয়ে বেশ সাজানো ঘর। একটা বছর চারেকের বাচ্চা মেয়ে ঘরের কোণে বসে ডল নিয়ে খেলছে। খানিকক্ষণ তাকে লক্ষ করে হঠাৎ বলল, তুমি কে গো ?

আমি ! আমি একজন পাপী।

পাপী কী ?

এ ম্যান ফুল অফ ভাইসেস। এ সিনফুল ম্যান।

তুমি আমার মায়ের বয়ফ্রেন্ড ?

ওঃ, তাহলে এই মেয়েটিই ক্ষণিকার মেয়ে। ক্ষণিকা খুব তার মেয়ের গল্প করে। বাপের বাড়িতে তার নিঃসঙ্গ দিদির জিম্মায় থাকে। তাতে ক্ষণিকা মুক্ত থাকতে পারে। উড়ে উড়ে বেড়াতে পারে।

সে বলল, আমি একজন পাপী খুকি।

ঝি চা নিয়ে এল। ক্ষণিকা এল না। তবে চা আসাটা ভাল লক্ষণ। বরফ গলতে চাইছে। ইগোর চৌকাঠটা ডিঙোতে পারছে না। লজ্জার লতা যেন জড়িয়ে ধরছে অভিসারে গমনোদ্যোগী শ্রীরাধিকার দুখানি পা। একটু গলা খাঁকারি দিল সমীরণ।

বাচ্চা মেয়েটা হাম্পটি ডাম্পটি গানটা গাইছে। আজকাল

কত বাচ্চাই গায়। সমীরণ চায়ে চুমুক দিল। এই সময়টায় ক্ষণিকার হৃদয়-বালতি ভরে আছে ফেনশীর্ষ দয়ার দুধে। এ সময়ে সে ভিখিরিকেও ফেরায় না। বাচ্চা মেয়েটার গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমীরণ একটু গুনগুন করল, ফেরাবে কি শূন্য হাতে ?

ঘুম-ঘুম চোখে সামান্য একটু আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শ্লথ পায়ে ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়াল ক্ষণিকা। চোখে নিস্পৃহ দৃষ্টি। ঢিলা একটা ড্রাগনের ছবিওলা কিমোনো পরনে। চুলগুলো অবিন্যস্ত। চোখে অপার বিস্ময়।

এর সবটাই যে অভিনয় তা জানে সমীরণ। ওই চাহনি, ওই শ্লথ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমা, ওই উপেক্ষার ভাব—ওর আড়ালেই রয়েছে সেই অমোঘ বালতিটা। টলটল করছে ভরভরন্ত দুধে।

উদ্বেল হতে নেই। চায়ের কাপটা ধীরে নামিয়ে রেখে মাথা নত করে অপরাধীর মতো বসে রইল সে। এও অভিনয়। কমল হাসান বা নাসিরুদ্দিন শা-র সঙ্গে সে এখন পাঞ্জা কষতে পারে।

তুমি ?

প্রশ্নটার জবাব দিল না সমীরণ। দিতে নেই। খুব ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু।

বাচ্চা মেয়েটা হঠাৎ বলে উঠল, ও লোকটা পাপী জানো মা ?

ক্ষণিকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেঁলে বলল, জানি। ওরকম বলতে নেই। ছিঃ।

বাঃ রে, ও-ই তো বলল।

বেশিক্ষণ ঘাড় নিচু করে থাকার ফলে সমীরণের ঘাড় টনটন করছিল। তবু থাকতে হচ্ছে।

ক্ষণিকা মুখোমুখি সোফায় এসে আলতোভাবে বসল। বলল, বোসো।

গলার স্বরটা নরম। সমীরণ খুব সাবধানে ধীরে ধীরে বসল।

জুলেখা চলে গেল বুঝি ? রাখতে পারলে না ?

সমীরণ একটু জিভ কেটে ফেলল। ভুলে। সামান্য খসখসে গলায় বলল, জানতে ?

ওমা ! জানব না কেন ? তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রায়ই তো গিয়ে সব দেখে আসতাম। নবর মা-র সঙ্গে কথা হত।

সমীরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পাপ কখনও গোপন থাকে না।

তা জানি না। তবে যাকে তাকে ডেকে আনছ, আজকাল কি ভীষণ এডস হচ্ছে তা জানো ?

পাপের বেতন মৃত্যু। জানি। কেন আমাকে একা ফেলে চলে আসো বলো তো ! তুমি কি জান না আমি একা থাকতে পারি না ? বিশেষ করে তোমাকে ছাড়া ? সেই জন্যই জুলেখাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। হয় তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, নইলে বাবা পার্মানেন্টলি বাঙ্গালোর পাঠাতে চাইছে, সেখানেই চলে যাব।

জুলেখাকে তুমি মোটেই তাড়াওনি।

আলবত তাড়িয়েছি। চলো, দেখবে।

দেখার দরকার নেই। জুলেখাকে তাড়িয়েছি আমি।

তুমি ?

হ্যাঁ। কাল আমি টেলিফোনে ওকে বিকেলবেলায় ধরেছিলাম।

ওঃ, তুমি মহীয়সী। তুমি কি জানো তোমার মতো—

থাক।

ক্ষণিকা, ক্ষমা—

আর হয় না সমীরণ। আর কিছুতেই—

আর কক্ষনো—

তোমার কথার কোনও দাম—

প্রমিজ। এই একবারটা—

না, প্লিজ। ফিরে যাও—

দয়া করো—

ওঃ সমীরণ—

তোমাকে ছাড়া—
মা, ও লোকটা কি পাপী ?
ছিঃ তোটন—
আমি পাপী। পঞ্চ ম-কার—
উঃ ওরকম কোরো না তো—
এবারকার মতো—
কী জ্বালা বাবা—
লক্ষ্মী সোনা—
বাঙ্গালোরেই যাও না—
না, না, তোমাকে ছেড়ে স্বর্গেও—
মিথ্যুক—মিথ্যুক—ভূতের ভয়ে—
পায়ে পড়ি—
আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে—

চল্লিশ মিনিট বাদে গাড়িতে পাশাপাশি বসে তারা ফিরে আসছিল। ক্ষণিকার গোল মুখশ্রীতে এখনও সকালের সেই অপারগ ক্ষমাশীলতা। ঘুম-ঘুম চোখ। অলস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, মিঠু মিত্রের লাভারটি কে বলো তো।

মিঠুর লাভার ? যাঃ। কেউ নেই।

আছে।

কী করে বুঝলে ?

জানি। হি হ্যাজ এ লাভার।, তোমার বান্ধবী বলেছে।

কে বান্ধবী ?

দ্যাট পুওর রেচেড্ গার্ল। মিতালি।

কী বলেছে ?

বেশ মাতাল হয়ে গিয়েছিল সেদিন। আমার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছিল একটা সময়ে। তখন বলল, ডু ইউ নো হি হ্যাজ এ লাভার ? শি লাভস হিম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালাল সমীরণ। তারপর সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, মেয়েটার নাম কী ?

সেটা বলেনি। সেজন্যই তো জানতে চাইছি।

সমীরণ মাথা নেড়ে বলল, আমিও জানি না। তবে তোমাকে একটা কথা বলি, মাতালদের কথায় কখনও বিশ্বাস কোরো না।

করি না। কিন্তু মিতালিকে সেদিন লক্ষ করেছো? শি ওয়াজ এক্সট্রিমলি ডিস্টার্বড। আর সেই জন্যই ওরকম আনাড়ির মতো মদ খাচ্ছিল। ডিস্টাবর্ড থাকার একটা কারণ তো আছে।

ব্যাপারটা লজিক্যাল নয়, কিন্তু শি ওয়াজ ইন লাভ উইথ মিঠু।

লজিক্যাল নয় কেন?

ডিভোর্সের এত দিন পর এবং এত দূরের দেশে থেকে হঠাৎ প্রেমে পড়ে যাওয়াটা কি স্বাভাবিক?

খুব স্বাভাবিক। মিতালির বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। তখন ওর ম্যাচিওরিটি ছিল না। পরে যখন ধীরে ধীরে পুরো ব্যাপারটা শান্তভাবে ভেবেছে তখন হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, কাজটা ঠিক হয়নি। মিঠু মিত্র তো চমৎকার মানুষ। টল, হ্যান্ডসাম, কারেজিয়াস অ্যান্ড কাম। কোয়াইট লাভেবল।

সমীরণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, এনিওয়ে সেই রিডিসকভারি অফ লাভ থেকেই হয়তো ও ওরকম রেস্টলেস হয়ে পড়েছিল।

মোটেই নয়। শি ওয়াজ ডিস্টার্বড বিকজ শি কেম টু নো দ্যাট দেয়ার ওয়াজ অ্যানাদার উওম্যান।

তুমি সিওর?

সিওর।

কে হতে পারে?

লেট আস থিংক।

ইয়েস লেট আস থিংক।

ক্ষণিকা চোখ বুজে ধ্যানস্থ হল। সমীরণ ধ্যানস্থ হতে সাহস করল না, কারণ সে গাড়ি চালাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ক্ষণিকা চোখ খুলে বলল, একটা ব্যাপার মনে পড়েছে।

কী সেটা ?

একটা মেয়ে টেবিলে বিরিয়ানি সার্ভ করছিল। বছর কুড়ি একুশ বয়স। পরনে একটা সবুজ রঙের গাদোয়াল ছিল। মুখখানা ভারী মিষ্টি। একটু ড্রিমি মুখ। চোখ দুখানা খুব নরম। মনে আছে ?

একটু গম্ভীর হয়ে সমীরণ বলে, তোমার মনে থাকা উচিত, ডিনারের সময় আমার বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

ডিনারের অনেক আগেই তাকে দেখতে পেয়েছ নিশ্চয়ই। মনে পড়ছে ?

আমি মেয়েদের দিকে তাকাই না।

শুধু তাকাও না, চোখ দিয়ে গিলে খাও।

আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে মেডিটেট করতে দাও। তার আগে বলো এই মেয়েটি সম্পর্কে কী বলেছিল মিতালি ?

কিছু বলেনি। মেয়েটা যখন বিরিয়ানির প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকছিল তখনই মিতালি একটু শিউরে উঠে যেন হিসিং সাউন্ড করে বলল, শি-শি ইজ ইন লাভ উইথ হিম !

ওই মেয়েটাকেই মিন করছিল ?

অফকোর্স। মেয়েটাকে দেখেই যেন রিঅ্যাক্ট করল। আমি জানতে চাই মেয়েটা কে ?

সবুজ শাড়ি আর অবুঝ মুখ তো !

অবুঝ মুখ মোটেই বলিনি।

এনিওয়ে, মনে পড়ছে না। শোনো, ছেলেরা কখনও মেয়েদের পোশাক মনে রাখতে পারে না।

তাহলে কী মনে রাখে ?

বেশি মনে রাখে চোখ। দু নম্বর, মুখশ্রী।

মুখশ্রীর কথা তো বললাম।

ডেসক্রিপশন ইনকমপ্লিট। আমি ভিসুয়ালাইজ করতে পারছি না।

চুলগুলো স্টেপকাট করা।

আর কিছু ?

দুদিকে দুটো মিষ্টি গজদাঁত আছে। হাসলে বেশ দেখায়।

যাঃ, ও তো জয়িতা !

সে কে ?

জয়িতা হল মিতালির খুড়তুতো বোন।

যাঃ বলছো কেন ?

ও সেরকম মেয়েই নয়।

কীরকম মেয়ে ?

ভীষণ ভাল টাইপের। ছেলেদের সঙ্গে মেশে না। খুব লাজুক।

ক্ষণিকা একটু হেসে বলল, লাজুকরা বুঝি প্রেমে পড়ে না ?

তা নয়। কিন্তু মিঠুর সঙ্গে ওর কোনও কানেকশনই নেই যে।

খোঁজ নাও।

নিয়ে লাভ ?

জাস্ট কৌতূহল।

সমীরণ মিটি মিটি হাসছিল। বলল, জয়িতা যদি কারও প্রেমে পড়ে তাহলে সে বেচারি ইহজীবনেও জানতে পারবে না যে একটা মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল।

তাহলে মিতালি জানল কী করে ?

ইউ ক্যান্ট বি সিওর।

আই অ্যাম সিওর।

ও.কে. ও.কে.। মেনে নিচ্ছি। তবু মনে রেখো, মিতালি ও কথা বলার সময় মাতাল হয়ে গিয়েছিল।

জানি। আমি মিতালিকে সামলাচ্ছিলাম। ন্যাপকিন দিয়ে চোখ মুখ মুছিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা জল খাইয়ে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে দিয়ে আসি। সোফায় বসেই হড়হড় করে বমি করে দিল। ভাগ্যিস উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, নইলে ডিনারটাই নষ্ট হত।

সমীরণ ভ্রূ কুঁচকে বলল, সামথিং ইজ টিকিং।

হোয়াটস টিকিং ?

ইউ মে বি রাইট।

আই অ্যাম রাইট।

ক্ষণিকা, শবর দাশগুপ্তর কানে কথাটা গেলে হি উইল মেক দি গার্ল আপ সাইড ডাউন।

কেন ?

লোকটা ভীষণ পাজি। তোমাকেও জ্বালাবে।

মেয়েটাকে জ্বালালে তোমার ক্ষতি কি ? হ্যাভ ইউ গট এ সফট কর্নার ফর হার ?

আরে না। শী ইজ জাস্ট এ কিড।

মোটেই নয়। কুড়ি একুশ যথেষ্ট বয়স। কীরকম বোন বললে ?

আপন খুড়তুতো বোন। ওর বাবা অরুণ ঘোষ আমাদের প্রফেসর ছিলেন। মাই গড !

কী হল ?

একটা কথা মনে পড়ল। জয়িতা হল ওনলি চাইল্ড। দুই ভাইয়ের ওই একটিই সারভাইভিং সন্তান। মিতালির নেক্সট অফ কিন। জয়িতা উইল ইনহেরিট এভরিথিং অফ মিতালি।

* * *

তখন কি তার তেরো বছর বয়স ? নাকি চৌদ্দ ? বোধহয় মাঝামাঝি। এলাহাবাদ ব্যাংকের একটা বিশেষ ব্রাঞ্চে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য তার বড্ড ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছিল হঠাৎ। বিশেষ একটা কাউন্টারে ছোট্ট মুখখানা বাড়িয়ে সে করুণ গলায় বলেছিল, আমি কি একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারি ?

মিঠু কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে চিনতে পারল। বাসরঘরে মেয়েটি অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছিল। মিঠুর কানে লেগে আছে একটা কলি, সখি ভালবাসা কারে কয়, সে কি সকলি যাতনাময় ...

একটু হেসে মিঠু বলেছিল, কেন পারবে না ?

মেয়েটি হাস্যহীন মুখে করুণ দৃষ্টিতে মিঠুর দিকে চেয়ে ছিল। ওই বয়সেও সে বুঝত, তার দিদি মিতালি এই লোকটাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে। নাকচ করেছে। অথচ মিঠুদাকে তার কী ভালই লেগেছিল বিয়ের রাতে। কেমন ভদ্র, কেমন গম্ভীর, কী পারসোনালিটি, আর কী দারুণ ম্যানলি চেহারা! মুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল সে। ওই বয়সে ওই তার প্রথম উথাল-পাতাল বুক। মিঠু যদি জামাইবাবু হয়ে থাকত তবে ঠিক সামলে নিত নিজেকে সে। কিন্তু বিয়ের পরই মিতালিদি এমন করতে লাগল! তারপর ছেড়েই দিল। বড্ড কষ্ট হয়েছিল তার। আবার সেই সঙ্গে অদ্ভুত এক আনন্দও।

অ্যাকাউন্ট খোলার পর একদিন, মাত্র একদিনই একটা ভুল করে ফেলেছিল, যার জন্য আজও নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না সে। একদিন টাকা তুলবার অছিলায় চেক-এর সঙ্গে জেমস ক্লিপে আঁটা একটা চিরকুট দিয়েছিল মিঠুকে। তাতে ইংরিজিতে লেখা ছিল, হাউ ডিপলি আই লাভ ইউ।

মিঠু চেকটা নিল, চিরকুটটা দেখল। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। ভীষণ গম্ভীর। আর একটাও কথা বলেনি সেদিন।

ভয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে সেদিন চলে এসেছিল জয়িতা। পনেরো দিন বাদে আবার গিয়েছিল। না, আর কখনও ভুল করেনি সে। শুধু কাউন্টারের এক পাশ থেকে অন্য পাশে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। কিন্তু তার হৃৎপিণ্ড এত জোরে শব্দ করেছিল সেদিন, মিঠু কি শুনতে পায়নি?

পেয়েছিল নিশ্চয়ই। তবু শুধু ভদ্র গলায় একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন আছো?

তারপর তিন বছর ধরে যতবার ব্যাংকে গেছে ততবারই ওই ভদ্র গলায় একটি প্রশ্ন, কেমন আছো? তার বেশি একটি কথাও নয়। কখনও নয়।

জয়িতা মৃদু স্বরে বলত, ভাল। আর তার বুকের ভিতরে উত্তাল হয়ে উঠত হৃৎপিণ্ড।

তিন বছর বাদে অন্য ব্রাঞ্চে প্রমোশন পেয়ে চলে গেল

মিঠু। একবার বলেও গেল না। জয়িতা অ্যাকাউন্ট তুলে নিল না। অপেক্ষা করল।

রসা রোডের দিকে তার যাওয়ার কথাই নয়। তবু স্কুলের পর তার মাঝে মাঝে লেক-এর দিকে যাওয়ার খুব দরকার পড়তে লাগল, প্রথম প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে। তারপর এক একদিন একা। এলাহাবাদ ব্যাংক তখন তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ব্যাংকের দরজা থেকে একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকত। দেখা হত না। একদিন সাহস করে ঢুকেছিল। অনেককে দেখল, যাদের দেখার দরকার ছিল না।

তারপর একদিন দেখল। মিঠু বেরিয়ে এল। কোনওদিকে না তাকিয়ে তার বিশাল মোটরবাইকে উঠে ভোঁ করে কোথায় চলে গেল।

যথেষ্ট। ওটুকুও তখন কম নয়। তিন দিন ধরে সেই দেখার রেশ রইল।

একদিন মাকে বলেছিল, আচ্ছা, মিঠুদা তো ইচ্ছে করলেই এখন বিয়ে করতে পারে, না মা ?

পারেই তো ! অত ভাল ছেলে !

তবে করছে না কেন ?

করবে করবে। হয়তো কথা চলছে। কে খবর রাখে বাবা ?

কেউ খবর রাখেও না। সে রাখত। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি মাত্র দু স্টপ দূর। সে হঠাৎ হঠাৎ গিয়ে হাজির হত। এ কথা সে কথা। তারপর মিঠুদার কথা।

জ্যাঠামশাই নিজের মেয়ের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। বলতেন, আমি কিছু ভুল করিনি। মিতালি একদিন বুঝবে।

জ্যাঠামশাই, মিঠুদা কি বিয়ে করবে ?

তা কি জানি মা ? মাঝে মাঝে আসে, খোঁজ খবর নিয়ে যায়। লজ্জায় সঙ্কোচে তাকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারি না। বিয়ে তো করাই উচিত।

বেশি দিনের কথা নয়। মাত্র এক দেড় বছর আগে

একদিন জ্যাঠামশাই বললেন, সামনের শনিবার মিঠুকে খেতে বলেছি। ভারী সঙ্কোচ। কিছুতেই রাজি হয় না। আমি বেশ লম্বা ছুটিতে আমেরিকা চলে যাচ্ছি বলে রাজি করিয়েছি। তুইও একটু আসিস তো মা। হরেনই রাঁধবে, কিন্তু সে পুরনো মানুষ, এখনকার রান্না জানে না। তুই একটু ওই চাইনিজ-টাইনিজ কিছু একটা রান্না করিস তো। ছেলেটা নিজে রেঁধে খায়, সেদ্ধপোড়া খেয়েই থাকে হয়তো।

তখন তার উনিশ বছর বয়স। তখন তার কী উদ্বেল হৃদয়! মারাত্মক শনিবারটা যেন ডবল ডেকারের মতো ধেয়ে আসছিল।

সেদিন তার মা-বাবারও ছিল নিমন্ত্রণ। রেসিপির বই দেখে খুব যত্ন করে সে রেঁধেছিল চিলি চিকেন আর প্রন ককটেল। জ্যাঠামশাইয়ের ছোট খাওয়ার টেবিলে চারজন খেতে বসেছে। জ্যাঠামশাই, মা, বাবা আর মিঠু। মুখ তুলে মিঠুই হঠাৎ বলল, এ কী, তুমি বসবে না?

সবেগে মাথা নেড়ে সে বলেছিল, না। আমি সার্ভ করব।

তাই কি হয়? বসে যাও, সবাই একসঙ্গে খাই।

শুনে সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুইও বসে যা। হরেন সার্ভ করবে।

কেমন একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হল, তাকে বসতে হল মিঠুর বাঁ পাশে, কাছ ঘেঁষে। চোখমুখ লজ্জায় ঝাঁ ঝাঁ করছিল তার। মুখ তুলতে পারে না, খাবে কী? আর তখন মিঠুর গা থেকে একটা মিষ্টি পুরুষালি উত্তাপ আসছিল। আর মাদক একটা গন্ধও। কথাবার্তা হচ্ছিল, সে একটুও বুঝতে পারছিল না কারও কথা।

মিঠু হঠাৎ বলল, এ সব তুমি রেঁধেছ? বাঃ, খুব ভাল রাঁধতে পারো তো তুমি! আর কী কী পারো বলো তো! গান গাইতে পারো, জানি। আর কিছু?

কিছু না।

মা বলল, ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে বি এ পড়ছে।

সে আমি জানি।

জানে! কী করে জানে মিঠু?

ডিনারের পর অনেক রাত অবধি গল্প হয়েছিল। না, জয়িতা কথাই বলেনি। শুধু কাছাকাছি একটা দূরত্বে বসে অনুভব করেছে মিঠুকে। সে এক অতলান্ত অনুভূতি। কী যে হচ্ছিল তার বুকের ভিতরে!

মিঠু কি তাকাচ্ছিল তার দিকে? সে দেখেনি। কিন্তু সে জানে, চোর চোখে মিঠু বহুবার দেখেছিল তাকে। বহুবার।

মা বাবার সঙ্গে সে যখন বেরিয়ে আসছিল তখন সঙ্গে সঙ্গে মিঠুও। বিদায় নেওয়ার একটু আগে হঠাৎ দু পা পিছিয়ে তার সঙ্গ ধরে বলল, তোমার চিরকুটটার জবাব দেওয়া হয়নি। একদিন দেব।

লজ্জায় মরে যাচ্ছিল সে। নার্ভাস। মিঠুর মোটরবাইকের শব্দ যতক্ষণ শোনা গিয়েছিল ততক্ষণ তার শরীরে ঝঙ্কার।

চিরকুটের জবাব দেবে বলেছিল মিঠু। জবাবটা এল মাসখানেক পর। এবং অভিনব উপায়ে। ডাকে তার কাছে এল সাদার্ন ক্লাবে ভর্তি হওয়ার একটা ফর্ম। সেই ফর্মের এক কোণে ছোট্ট করে লেখা "প্লিজ। মিঠু।" হাসবে না কাঁদবে ভেবেই পেল না জয়িতা। এটা কি রসিকতা? নাকি অন্য কিছু?

অনেক ভেবে সে বুঝতে পারল, মিঠু হয়তো তার সঙ্গ চায়। কিন্তু সঙ্গ পাওয়ার অন্য কোনও উপায় হয়তো ভেবে পায়নি। অল্পবয়সীদের মতো মাঠে ময়দানে বা হোটেল রেস্টুরেন্টে বসে প্রেম করা হয়তো মিঠুর পছন্দ নয়। হয়তো সাদার্ন ক্লাবে ব্যায়াম বা মার্শাল আর্টের ক্লাসে তারা অনেক কাছাকাছি হতে পারবে।

অনেক লজ্জা সঙ্কোচ, অনেক দ্বিধা জয় করতে হয়েছিল জয়িতাকে। একদিন কুণ্ঠিত পায়ে হাজিরও হল সাদার্ন ক্লাবে। তাকে দেখে মিঠুর মুখে ভারী চমৎকার একটা হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই হাসিটাই তার প্রথম উপহার।

জয়িতা জীবনে কখনও কোনও খেলাধুলো বা ব্যায়াম

করেনি। প্রথম প্রথম তার শরীরে কী ব্যথাই না হয়েছিল। তবু করত। মিঠু বলত, ক'দিন পরেই দেখবে শরীর কেমন হাল্কা আর ফিট লাগবে।

কখনও তাদের মধ্যে স্পষ্ট করে কোনও ভালবাসার কথা হয়নি। সব সময়ে তার দরকারও হয় না। ভালবাসার মধ্যে একটা নীরবতাও কি নেই? সে নিজে প্রগলভ নয়। মিঠুও কম কথার মানুষ। তারা খুব কাছাকাছি হত, যখন কারাটে ক্লাসের পর মিঠু তাকে মোটরবাইকের পিছনে চড়িয়ে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিত। কখনও পাড়ায় ঢুকত না বা বাড়িতেও আসত না। বলত, মেলামেশাটা একটু গোপন থাকাই ভাল, নইলে তোমাকে লোকে বদনাম দিতে চেষ্টা করবে। বাড়ির লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

কিন্তু গোপন করলেও খুব গোপন থাকেনি তাদের সম্পর্ক। মাস কয়েক বাদে একদিন মা তাকে ধরল, হ্যাঁ রে, কী ব্যাপার বল তো!

কী ব্যাপার মা?

তোর কি মিঠুকে পছন্দ?

কী লজ্জা! কী লজ্জা! মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। জবাব এলই না মুখে।

মা বলল, মিতালির সঙ্গে ওর বিয়েটা হয়েছিল, সেইটেই একটা খারাপ ব্যাপার, নইলে মিঠু তো চমৎকার ছেলে। ভাল করে ভেবে দেখ।

ভেবে দেখবে? ভেবে দেখার কী আছে! তার তো মিঠুময় জগৎ। মিঠু ছাড়া সে আর কিছু ভাবতেই পারে না।

মা তার নীরবতারও অর্থ ধরতে পারল। বলল, বেশ, তোর বাবাকে বলি। মনে হয়, অমত করবেন না। কিন্তু বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে মেলামেশাটা বন্ধ করতে হবে।

এক অপার্থিব আলোয় যেন ভরে গেল জয়িতার জগৎ। এত আনন্দও যে জীবনে আছে তার জানাই ছিল না।

সেদিন সন্ধেবেলা সে খুব লাজুক গলায় মিঠুকে বলল, মা জানতে পেরেছে।

মিঠু সামান্য অবাক হয়ে বলল, কী করে জানলেন ?

তা তো জানি না। তবে অমত করেনি।

মিঠু একটু চুপ করে থেকে খুব ধীর কণ্ঠে বলল, মিতালি আমার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছিল। তুমি তা ফিরিয়ে দিয়েছ। আমার জন্য আর কেউ এতটা করেনি, তোমার মতো।

জয়িতা খুব ফিসফিস করে বলেছিল, এখন কী হবে ?

মিঠু একটু হেসে বলল, কী হবে জান না বুঝি ?

মাথা নেড়ে জয়িতা বলল, না তো ?

এই প্রথম তাদের মধ্যে ভালবাসার সংলাপ। এইটুকুই মাত্র কথা, কিন্তু উত্তাপ আর আবেগে যেন মাখামাখি। মিঠুর মোটরবাইক সেদিন যেন মাটিতে নয়, আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

কথাটা বাবার কানেও তুলল মা। তার বাবা মাত্র এক মিনিট চিন্তা করে বলল, হোয়াই নট ? বয়সের তফাতটা একটু বেশি, তা হোক। তাতে ভালই হবে। মিঠুর প্রতি যে অন্যায়টা হয়েছে এতে তারও খানিকটা শোধবোধ হবে।

কোথাও কোনও আপত্তি উঠল না। মসৃণ একটা পরিণতির দিকেই যাচ্ছিল তারা।

কিন্তু আপত্তি উঠল অপ্রত্যাশিত একটা জায়গা থেকে। জ্যাঠামশাই আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর বাবা একদিন গিয়ে তাঁকে বললেন ব্যাপারটা।, জ্যাঠামশাই যেন ভীষণ চমকে উঠে বললেন, না না, তা হয় না। তা কিছুতেই হয় না।

জয়িতার বাবা অবাক হয়ে বললেন, কেন হয় না ? কোথাও তো বাধক দেখছি না।

জ্যাঠামশাই বার বার বললেন, বাধা আছে। সে তুই বুঝবি না।

জ্যাঠামশাই আর ব্যাখ্যা করেননি। ব্যাখ্যা করার সময়ও আর পাননি। পরদিনই গভীর রাতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান। সেরিব্র্যাল।

খুব কেঁদেছিল জয়িতা। একটা সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। মিঠু তার ভূতপূর্ব শ্বশুরের শ্মশানবন্ধু হয়েছিল।

দুদিন বাদে এয়ারপোর্টে মা-বাবার সঙ্গে জয়িতা গিয়েছিল মিতালিকে নিয়ে আসতে। কী উদভ্রান্ত, শোকাহত চেহারা মিতালির! এক ঝটকায় যেন বয়স বেড়ে গেছে অনেক। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল মিতালিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। মিতালি বলল, না কাকু, তার দরকার নেই। ও বাড়িতে বাবার কত স্মৃতি আছে বলো তো! বরং জয়িতা কয়েকদিন আমার সঙ্গে থাক। নইলে আমার একা লাগবে।

প্রথম দু-চারটে দিন শোকের ভাবটা কাটিয়ে ওঠার পরই তাদের দুই বোনের মধ্যে কথার ফোয়ারা খুলে গেল। দিনের বেলায় জয়িতার কলেজ, মিতালিরও উকিল অ্যাটর্নির কাছে বা ব্যাঙ্কে যাওয়া। গল্প হত রাতে। দোতলায় শোওয়ার ঘরে মস্ত খাটে পাশাপাশি শুয়ে।

শ্রাদ্ধ বা নিয়মভঙ্গ কোনও অনুষ্ঠানেই মিঠু আসেনি। কিন্তু এক সন্ধেবেলা সাদার্ন ক্লাব থেকে বেরিয়ে মাঠের ওপর খানিকটা একসঙ্গে হেঁটেছিল দুজন। মিঠু একটু চিন্তিত। বলল, জয়িতা, মিতালি আমাকে কিছু বলতে চায়।

কী?

তা জানি না। কিন্তু তোমাকে একটা অনুরোধ করব।

বলুন না।

তুমি আমাদের কথা, তোমার আমার কথা মিতালিকে জানিয়ে দিয়ো।

কেন? আমার যে ভীষণ লজ্জা করবে।

তোমার লজ্জা নিয়েই তো হয়েছে আমার বিপদ।

মিতালিদির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

হ্যাঁ, মিতালি আমার ব্রাঞ্চে গিয়েছিল।

ও মা!

শি ইজ এ বিট অফ রিপেন্টেন্ট।

জয়িতার বুক অজানা ভয়ে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সে উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল, তা হলে কী হবে?

মিঠু একটু হাসল, কী হবে তুমি জান না ?

বলুন না !

মিতালি অনেক দূরে সরে গেছে জয়িতা ।

জয়িতার বুকে সে যে, কাঁপুনি উঠল সে বোঝাতে পারবে না ।

মিতালি মস্ত পার্টির আয়োজন করল । ককটেল ডিনার । জয়িতার ইচ্ছে ছিল পার্টির পর মিতালিকে ফাঁক বুঝে বলবে কথাটা । কিন্তু কী হল, আগের রাতে যখন দু বোনে কথা হচ্ছিল তখন মিতালি বলল, তুই কি প্রেমে পড়েছিস ?

জয়িতা অবাক হয়ে বলল, কেন বলো তো !

তোর মুখচোখ বলছে, তোর গলার স্বর বলছে, তোর আনমনা ভাব বলছে, তুই প্রেমে পড়েছিস ।

জয়িতা দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল ।

লজ্জার কী আছে ? বল না ।

জানি না ।

তার মানে সত্যিই প্রেমে পড়েছিস । কে রে ?

জয়িতা একটা বুদ্ধির কাজ করল । বলল, আজ নয় মিতালিদি । কাল বলব ।

কেন ? কাল কেন ?

জয়িতা বলেনি । সেই রাতটা সে ভাল করে ঘুমোতেও পারেনি ।

পরদিন সকাল থেকেই ঘরদোর সাজানো, পরিষ্কার করা এসব নিয়ে ব্যস্ত রইল তারা । দুপুরে খাওয়ার টেবিলে যখন দুজনে মুখোমুখি তখন মিতালি জিজ্ঞেস করল, কাল বলিসনি । আজ বলবি ?

বলব । খেয়ে নাও । তারপর বলব ।

খেতে খেতেই মিতালি বলল, ছেলেটা ভাল ?

জানি না ।

ভাল করে বলছিস না কেন ?

বলব মিতালিদি ? বললে তুমি রাগ করবে না ?

রাগ করব ? তুই কাউকে ভালবাসলে আমার রাগ করার

কী ?

খাওয়া তখন শেষের মুখে। জয়িতা শুধু মিঠুর আদেশ পালন করার জন্যই তার সব লজ্জা সঙ্কোচ আর ভয় মুঠোয় ধরে রেখেই বলল, মিঠুদা।

কে বললি ? বলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল মিতালি।

জয়িতা মাথা নিচু করে টেবিল ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সে কী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সেটা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল তার। মিতালি বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ বসে রইল খাওয়ার টেবিলে। তারপর একতলার লিভিং রুমের সোফায় অনেকক্ষণ পড়ে ছিল চুপচাপ। তারপর ডেকোরেটরের লোকেরা এল ডাইনিং হল-এ টেবিল চেয়ার সাজাতে। এল ক্যাটারার। তাকে উঠতে হল। আড়াল থেকেই তাকে লক্ষ করছিল জয়িতা। সামনে যায়নি।

মিঠু এল বিকেলের দিকে। হঠাৎ।

দৃশ্যটা এ জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না জয়িতা। দোতলায় সাজছিল মিতালি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে মিঠুর দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ একটা অস্ফুট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিঠুর বুকে। ভগ্নস্তূপের মতো। শুধু বলছিল—প্রবল কান্না ভেদ করে বলছিল, বিশ্বাস করি না—বিশ্বাস করি না—

মিঠু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। জয়িতা চলে গেল পিছনের বাগানে। এ দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

তাকে গিয়ে পিছনের বাগানে ধরল মিতালিই। চোখের জল মুছে ফেলেছে, মুখে একটা হাসি ফুটিয়েছে অনেক কষ্টে। তাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরে বলল, বেশ করেছিস। বেশ করেছিস। আমি খুশি হয়েছি। বিশ্বাস কর।

জয়িতা বিশ্বাস করেনি। তবু বলেছিল, আমি তো জানতাম না মিতালিদি—

মিতালি একটু চুপ করে থাকার পর বলল, এ কি জানার মতো কথা ? কিছু নয় রে। আমি তো একটা পাগল, কত

ভুল করেছি জীবনে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মুখে বলল, কিন্তু কিছুই ঠিক ছিল না সেদিন মিতালির। জন্মে মদ ছোঁয়নি। সেদিন জলের মতো খেল। কত কী উল্টোপাল্টা বলতে লাগল লোকজনকে। কেঁদে ফেলল, হাসতে লাগল। কিছু ঠিক ছিল না।

পার্টি শেষ হওয়ার একটু বাদেই চলে এসেছিল জয়িতা। বুক ভার, মনে ভয়, অনিশ্চয়তা, এই অদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে কী ভাবে মুক্তি ঘটবে।

॥ পাঁচ ॥

জয়িতা দেবী, মিতালি দেবীর খুনের কেসে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে।

কিন্তু পুলিশকে আমি তো যা বলার বলেছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা আমি জানি। কিন্তু তদন্ত যত এগোয় ততই নতুন নতুন তথ্য বেরোতে থাকে, নতুন নতুন সত্য উদঘাটিত হতে থাকে—একটু শক্ত বাংলা বলে ফেললাম, মাফ করবেন—আর যত এ সব হতে থাকে ততই মামলার প্যাটার্নটা পাল্টে যেতে থাকে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আবার নতুন করে জেরা করা ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না।

বলুন।

মিঠু মিত্র নামে কাউকে কি আপনি চেনেন?

চিনব না কেন? উনি আমার জামাইবাবু।

বাঃ, বেশ বেশ। কতদিন চেনেন?

মিতালিদির বিয়ের সময় থেকে।

চমৎকার। আপনি নিজেই বলেছেন যে, উনি আপনার জামাইবাবু। তার মানে কি যে, উনি এখনও আপনার জামাইবাবু এবং আপনি ওঁর শালি?

তার মানে?

মানে বিয়ের ইমিডিয়েট পরেই যে ওঁদের ডিভোর্স হয়ে

যায় এটা কি আপনার জানা নেই ?

কেন থাকবে না ?

আফটার ডিভোর্স যখন আইনত স্বামী আর স্ত্রীর সম্পর্ক থাকে না তখন সেই বিয়ের সূত্রে গড়ে ওঠা আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোও কি থাকে ? না, থাকা উচিত ?

ওঃ হ্যাঁ। সেই অর্থে আমাদের সম্পর্ক নেই।

অন্য কোনও অর্থে আছে কি ?

তার মানে ?

মিঠু মিত্র আর আপনার জামাইবাবু নন, আপনিও ওঁর শালি নন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আত্মীয়তা ছাড়াও তো কত রকমের সম্পর্ক হয়। আমি জানতে চাই, মিঠু মিত্রের সঙ্গে আপনার কোনও যোগাযোগ ছিল কি ?

ছিল।

সেটা কী রকম ?

চেনাজানা ছিল।

আর কিছু ?

আমি সাদার্ন ক্লাবে কারাটে শিখতাম। উনি ওখানকার ইনস্ট্রাক্টর।

বাঃ, চমৎকার। কারাটে শিখতেন ? হঠাৎ কারাটে কেন ?

ইচ্ছে হল।

আপনি কি স্পোর্টিং টাইপ ? খেলাধুলো ভালবাসেন ?

বাসি।

স্কুল-কলেজের স্পোর্টসে নেমেছেন কখনও ?

না।

ফুটবল ক্রিকেট বোঝেন ?

না। একটু একটু।

কখনও দৌড়ঝাঁপ করেছেন ?

না।

তবু হঠাৎ কারাটে শেখার ইচ্ছে হল ?

হ্যাঁ।

বেশ বেশ। আপনার বাড়ি থেকে সাদার্ন ক্লাব বেশ

খানিকটা দূর। আপনি কিসে করে যাতায়াত করতেন?

বাসে।

বাসে যেতেন এবং আসতেন?

হ্যাঁ।

ভাল করে ভেবে বলুন। বাসে যেতেন এবং আসতেনও?

কখনও কখনও মিঠুদা মোটরবাইকে পৌঁছে দিতেন।

বাঃ, বেশ বেশ। ওঁদের বিয়ের সময় আপনার বয়স কত ছিল?

বারো তেরো।

এখন কত?

কুড়ি চলছে।

গুড। আপনি কি জানেন যে, আপনারা—অর্থাৎ আপনার বাবা, মা এবং আপনি—বিশেষ করে আপনি মৃতা মিতালি ঘোষের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

জানি না।

শুধু কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গের নয়, মিতালি দেবীর আমেরিকার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি এবং টাকাপয়সারও আপনারাই ওয়ারিশান। জানেন?

সে রকম কথা কিছু শুনিনি।

শুনবেন। কারণ আপনারাই মিতালি দেবীর নেক্সট অফ কিন।

হতে পারে।

আপনি না জানলেও অন্য অনেকেই কিন্তু খবর রাখত যে, বরুণ ঘোষ ও তাঁর মেয়ে মিতালি ঘোষের নিকটাত্মীয় আপনারাই। আপনারাই তাঁদের ওয়ারিশান।

জয়িতা চুপ করে রইল।

সাদার্ন ক্লাবে আপনি কবে ভর্তি হয়েছেন?

দু' বছর হবে।

নিজে থেকেই গিয়ে ভর্তি হলেন?

হ্যাঁ।

মানে হঠাৎ আপনার কারাটে শেখার ইচ্ছে হল আর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সাদার্ন ক্লাবে ভর্তি হলেন—ব্যাপারটা এভাবেই ঘটেছিল কি ?

হ্যাঁ।

আপনি কি জানতেন মিঠু মিত্র ওখানে কারাটে শেখান ?

জানতাম।

তার মানে কি ওঁর কাছেই কারাটে শেখার আগ্রহ ছিল আপনার ?

ঠিক তা নয়। মিঠুদা থাকলে সুবিধে হবে, তাই—

সুবিধে নানারকমই আছে। বাই দি বাই, মিঠুবাবুকে আপনি কি বরাবরই মিঠুদা বলে ডাকেন, নাকি জামাইবাবু ?

মিঠুদা।

কেন, বাঙালি মেয়েরা তো বড় ভগ্নীপতিকে সাধারণত জামাইবাবু বলেই ডাকে।

অনেকে দাদাও ডাকে।

হ্যাঁ, তা বটে। আপনি দাদাটাই প্রেফার করেন তা হলে ?

হ্যাঁ।

বাঃ বেশ। মিঠু মিত্র মাঝে মাঝে আপনাকে মোটরবাইকে লিফ্‌ট দিতেন ?

হ্যাঁ।

মাঝে মাঝে ? না রোজ ?

রোজ নয়। প্রায়ই।

একটু ভেবে বলুন। কারাটে ক্লাবের অন্য মেম্বাররা যদি বলে রোজ ?

রোজ পৌঁছে দিলেই বা ক্ষতি কী ?

ক্ষতি ? ক্ষতির প্রশ্নই ওঠে না। আমরা সত্যি কথাটা জানতে চাইছি মাত্র।

রোজ।

বাঃ এই তো চাই। কবে থেকে আপনাদের মধ্যে শালি আর ভগ্নীপতির সম্পর্কটা ঘুচে গিয়েছিল বলতে পারেন ?

না। জানি না।

আপনাদের মধ্যে সম্পর্কটা কি কেবল প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর ?

হ্যাঁ।

একটু ভেবে বলুন। কারণ আমাদের সংগৃহীত তথ্য অন্য কথা বলছে।

কী বলছে ?

আপনাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। আপনারা পরস্পরকে ভালবাসেন। শুধু তাই-ই নয়, আপনাদের বিয়ের কথাবার্তাও চলছে। ঠিক বলছি ?

জয়িতা খানিকক্ষণ চুপ থেকে মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ।

দয়া করে বলবেন কি যে এই প্রেম এবং বিয়ের ব্যাপারে আসল ইনিশিয়েটিভ কার বেশি ? আপনার না মিঠুবাবুর ?

আমার।

আপনার ?

হ্যাঁ। মিতালিদি ওঁকে ডিভোর্স করার পর থেকেই আমি ওঁর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি।

ডিভোর্স না করলে ?

তা জানি না। হয়তো মেনে নিতাম।

বাঃ। কিন্তু একটা খটকা থেকে যাচ্ছে।

কিসের খটকা ?

মিতালি দেবী হঠাৎ মারা গেলে আপনিই যে ওঁর বিপুল সম্পত্তি পাবেন এটা মিঠুবাবুর মতো বুদ্ধিমান লোকের না জানা থাকার কথা নয়।

তাতে কী হল ?

আপনার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে ওঁরই বেশী আগ্রহ থাকার কথা। তাই না ?

আমি বুঝতে পারছি না।

যাকগে। এখন বলুন, মিতালি দেবী ফিরে আসার পর থেকেই কি আপনি ওঁর সঙ্গে ওঁদের বাড়িতে থাকতেন ?

হ্যাঁ। মিতালিদি লোনলি ফিল করছিলেন, তাই আমাকে থাকতে বলেন।

একটানা ছিলেন ?

হ্যাঁ। তবে রাতটা। দিনের বেলায় আমার কলেজ থাকত, মিতালিদিরও কাজ থাকত।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো। কিন্তু খুনের রাতে আপনি ছিলেন না।

না।

কেন জানতে পারি ?

সেদিন মিতালিদি হঠাৎ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যান। মাতলামিকে আমি ভীষণ ভয় পাই।

ঠিকই তো। মাতলামি মোটেই পছন্দ করার জিনিস নয়। আচ্ছা, মিতালি দেবী কি প্রায়ই ড্রিংক করতেন ?

না। কক্ষনো নয়।

তাহলে সেদিন ড্রিংক করলেন কেন বলতে পারেন ?

না।

না ? আপনি তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকদিন একটানা বাস করেছেন, তবু জানেন না তিনি হঠাৎ সেদিন কেন ড্রিংক করলেন ?

না।

আপনাকে তিনি কিছু বলেননি ?

না।

আপনি কিছু দেখেননি ?

না।

কিছু অনুমানও করেননি ?

না।

সেদিন মিঠুবাবুর সঙ্গে মিতালি দেবীর দেখা হয়েছিল, তা তো জানেন ?

জানি।

তাঁদের মধ্যে কী কথা হয় ?

আমি শুনিনি।

আপনি কি জানেন যে, মিতালি দেবীর মিঠুবাবুর প্রতি মনোভাব বদলে গিয়েছিল ?

না, আমি জানতাম না।

জানতাম না মানে তখন জানতেন না, কিন্তু এখন জানেন?

এখনও জানি না।

এই জেরক্স কপিগুলো দেখুন তো। এ কি মিতালি দেবীর হাতের লেখা?

হ্যাঁ।

কষ্ট করে একটু পড়বেন কি? সবটা পড়ুন।

জয়িতা পড়ল। শবর দাশগুপ্ত ঈগলের চোখে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। পড়ার পর জয়িতার হাত থেকে কাগজগুলো ফেরত নিয়ে শবর তার ব্রিফকেস-এ ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, কিছু বুঝতে পারলেন?

হ্যাঁ। মিতালিদি মিঠুদার প্রতি সফ্‌ট হয়ে পড়েছিল।

এগজ্যাক্টলি। আপনি কি জানেন যে ওর সেই সফ্‌টনেস এতটাই ছিল যে উনি মিঠু মিত্রকে ওঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির কাস্টোডিয়ান করে দিয়েছেন?

জানি। মিঠুদা বলেছে।

জয়িতা দেবী, মিতালি দেবীকে কে খুন করেছে বলে আপনার মনে হয়?

জানি না।

জানতে বলছি না। লজিক্যাল অনুমান বলে তো একটা ব্যাপার আছে!

আমি জানি না।

তাহলে ঘটনাগুলো একটু সাজিয়ে দিই। আপনার সুবিধে হবে। মিঠু মিত্র একজন বড়লোকের একমাত্র সন্তান মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে—যাকে বিয়ে করার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁর ছিল না। বরুণ ঘোষের বেনামা অ্যাকাউন্ট এবং সম্ভবত আরও দু-চারটি গুপ্ত খবর তিনি জানতেন। মে বি দেয়ার ওয়াজ এ টাচ অফ ব্ল্যাকমেল ইন দা ম্যারেজ। কিন্তু বিয়ে টিকল না। মিতালি দেবী ডিভোর্স করে আমেরিকায় চলে গেলেন। সুতরাং মিঠু মিত্রের

তেমন লাভ হল না। কিন্তু কপালটা ভাল, তিনি আপনার সন্ধান পেয়ে গেলেন এবং একটা চমৎকার প্ল্যান করে রাখলেন। প্ল্যানটা অবশ্য একটু ফার ফেচেড, এটা আমি স্বীকার করছি। হয়তো প্ল্যান ওঁর ছিল না। কিন্তু সুযোগ এসে গেল। বরুণ ঘোষ মারা গেলেন এবং মিতালি দেবী দেশে ফিরলেন। দেখুন কীরকম গোল্ডেন অপরচুনিটি। মিতালিকে সরিয়ে দেওয়া গেলে দুটো কাজই হয়। এক, বহুকালের হারানো অপমানের শোধ নেওয়া এবং আপনাকে প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দেওয়া। শুধু তাই-ই নয়, আমেরিকাতেও বেশ ভাল সম্পত্তি থাকায় তার ইনহেরিটর হিসেবে আপনার এবং আপনার হাজব্যান্ড হিসেবে ওঁরও ভবিষ্যতে আমেরিকায় যাওয়া এবং গ্রিন কার্ড পাওয়ার সম্ভাবনা খুলে দেওয়া। সুতরাং মিঠু মিত্র এই সুযোগ ছাড়লেন না। কিন্তু মুশকিল দেখা দিল মিঠুর প্রতি হঠাৎ মিতালির প্রেম। মিতালিকে খুন না করে, শুধু আবার বিয়ে করে ফেললেই মিঠু মিত্রের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যেত। কিন্তু আমার অনুমান, তিনি সত্যিই আপনাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাই মিতালিকে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যানেই স্টিক করে থাকতে হল। ওঁর কপাল সত্যিই তুলনাহীন। কারণ মিতালি দেবী মারা গেলেই যে আপনি ওঁর সম্পত্তি বা টাকা পয়সা হাতে পেতেন তা নয়। উত্তরাধিকার আইন কমপ্লিকেটেড এবং সাকসেশন সার্টিফিকেট পাওয়া সময়সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রেও মিঠু কেল্লা মেরে দিলেন মিতালি ওঁকে কাস্টোডিয়ান করে দেওয়ায়। সুতরাং লজিক্যাল কনক্লুশনে যাওয়া কি খুব শক্ত বলে মনে হচ্ছে আপনার? আপনি কাঁদছেন? গুড। আশা করি মূল্যবান চোখের জলটা আপনি সমাজের একজন জঘন্য অপরাধী, একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনির জন্য অপব্যয় করছেন না! এই কান্নাটা যদি অসহায় হতভাগিনী মিতালি দেবীর জন্য হয়ে থাকে তবে ইট ইজ মোস্ট ওয়েলকাম।

আমি আর পারছি না। আমাকে আজ ছেড়ে দিন।

জয়িতা দেবী, আর একটা ছোট্ট প্রসঙ্গ আছে। খুব অপ্রিয় প্রসঙ্গ। কিন্তু জরুরি। আপনি বরং টয়লেট থেকে ঘুরে আসুন। চোখেমুখে ভাল করে জলের ঝাপটা দেবেন, ইউ উইল ফিল গুড। যান।

জয়িতা গেল। অনেকটা সময় নিয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিল। তারপর আয়নায় নিজের মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। মাত্র কুড়ি বছরের জীবন তাকে কত কিছু শেখাচ্ছে।

বাইরের ঘরে এসে বসতেই শবর হাসল, এই তো বেশ নরম্যাল লাগছে আপনাকে। গুড। এবার সেই কথাটা।

বলুন।

আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে মিতালি দেবীকে খুনের পিছনে আপনারও একটা মোটিভ আছে?

আমার?

আরে না না, ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে সন্দেহ করছি না। কিন্তু কথাটা খুব সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে।

আমি কেন খুন করব?

করেনওনি। কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটর মে রেইজ এ কোশ্চেন। প্রশ্ন তুলতে পারে মিঠু মিত্রের উকিলও। সব দিক ভেবে রাখা ভাল।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি মিঠুকে ভালবাসেন। ঠিক তো?

হ্যাঁ।

ভালবাসার জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে, স্বীকার করেন?

হ্যাঁ।

আপনি যখন মিতালি দেবীর বাড়িতে ছিলেন তখন নিশ্চয়ই আপনারা দুই বোন অনেক বিষয়ে কথা বলতেন!

হ্যাঁ। আমরা রাত দুটো তিনটে পর্যন্তও আড্ডা মারতাম।

গুড। কী বিষয়ে কথা হত আপনাদের?

মোস্টলি আমেরিকা। ওখানকার লাইফ স্টাইল,

লোনলিনেস, ঐশ্বর্য —এই সব নিয়ে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমেরিকা তো থার্ড ওয়ার্ল্ড পিপলের কাছে সবচেয়ে বেশি আলোচ্য বিষয় হবেই। খুব স্বাভাবিক। ধরুন প্রশ্ন উঠল যে, এইসব গল্পের ফাঁকে ফাঁকে মিতালি দেবী আপনাকে তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তনের কথাও জানিয়েছিলেন। তিনি যে আসলে মিঠুকে ভুলতে পারেননি এবং নতুন করে তাঁর প্রেমে পড়েছেন এবং রিকনসিলিয়েশনের চেষ্টা করছেন সেসব কথাও বলেছেন।

না, মিতালিদি বলেননি।

আহা, সে তো বটেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠলে কী করবেন? বিশেষ করে প্রশ্নটা যদি হয় ভীষণ লজিক্যাল অ্যান্ড ডাউন টু আর্থ? তাই বলছিলাম, এগুলোও ভেবে রাখা ভাল।

কী ভাবব?

ধরুন উকিল আপনাকে বলল যে, মিতালি দেবীর হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা জানতে পেরে আপনি আপসেট হয়ে পড়েছিলেন অ্যান্ড ভেরি জেলাস। কারণ, আপনার বয়স মাত্র কুড়ি, আপনি অনভিজ্ঞ। হৃদয় জয়ের লড়াইতে আপনি মিতালি দেবীর সঙ্গে নাও পেরে উঠতে পারেন। জেলাসি ইজ এ ডেনজারাস থিং। তাই না? তাছাড়া ইনহেরিটেনসের প্রশ্ন তো আছেই। মিতালি মারা গেলে আপনি প্রচুর লাভবান হবেন। সুতরাং আপনি যদি মিতালি দেবীকে মেরে ফেলতে চান সেটাও অস্বাভাবিক বলে মনে করার কিছু নেই।

কী বলছেন আপনি?

আহা, উত্তেজিত হবেন না। আমি শুধু আদালতের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আপনাকে অ্যালার্ট করছি। আচ্ছা, মিতালি দেবী তাঁর সেন্টের শিশিগুলো কোথায় রাখতেন আপনি জানেন?

কেন জানব না? ও অনেক পারফিউম এনেছিল। কিছু সুটকেসে ছিল, কয়েকটা বের করে ড্রেসিং টেবিলে রেখেছিল।

আপনি কি জানেন যে খুনি পালানোর সময় অনেকগুলো

সেন্টের শিশি ভেঙে সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, যাতে পুলিশ কুকুর গন্ধ না পায় ?

শুনেছি।

দ্যাটস গুড। ও বাড়ি থেকে আপনি ক'টার সময়ে চলে আসেন ?

রাত দশটা।

একাই ফিরেছিলেন ?

হ্যাঁ।

তখনও পার্টি চলছিল ?

হ্যাঁ।

আপনাকে চলে আসতে কে কে দেখেছে ?

জানি না। আমি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে চলে আসি। পিছনের বাগানের রাস্তা দিয়ে।

সেদিন রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন ?

আমার ঘরে। আর কোথায় থাকব ?

হুঁ। বেশ গণ্ডগোলে ফেলে দিলেন।

কেন ?

আপনার কেসটা ফুলপ্রুফ নয়। এনিওয়ে, ফর দি টাইম বিয়িং আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। ধরুন খুনটা আপনি করেননি।

আমি করিনি। ছিঃ ছিঃ, এসব কী কথা বলুন তো !

ফের উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। আপনার যাতে বিপদ না হয় তা আমি দেখব। কিন্তু আমার কিছু তথ্য চাই।

কী তথ্য ?

মিঠু মিত্র কেমন লোক ?

ভীষণ ভাল।

ভেবে বলুন।

ওকে নিয়ে আমি সব সময়েই ভাবি।

আপনি ওঁর জন্য সব কিছু করতে পারেন ?

পারি।

ইভন এ মার্ডার?

আমি খুন করিনি।

সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। কথাটার জবাব দিন।

আমি ওকে ভালবাসি, ওর জন্য সব ত্যাগ করতে পারি। এর বেশি জানি না।

কথাটা লজিক্যাল হল না। অথচ আপনি লজিক ভালই জানেন। আপনি ফিলজফির ছাত্রী।

আমার লজিক ওরকম নয়। মিঠুদা খুব ভাল জেনেই আমি ওকে ভালবাসি।

সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছেন। কারও সম্পর্কে আগ বাড়িয়ে ধারণা করাটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো। দুনিয়ায় এমন অনেক খুনি আছে যাদের পরম সাধুপুরুষ বলে মনে হয়। অ্যাপারেন্টলি।

আমি অত জানি না।

না জানাটা কাজের কথা নয়। শুনুন, আপনি যদি খুনটা নাও করে থাকেন তা হলেও আপনি খুনির সাহায্যকারী হিসেবে সন্দেহের পাত্রী হতে পারেন। কারণ আপনার অ্যালিবাই নড়বড়ে। কেউ আপনাকে ও বাড়ি থেকে চলে আসতে দেখেনি। ধরা যাক প্রশ্ন উঠল, আপনি সেদিন ও বাড়ি থেকে আসেননি। আপনি লুকিয়ে ছিলেন। রাত গভীর হলে মিঠু ফিরে আসে এবং আপনি তাকে বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করেন। তারপর মিঠু মিতালি দেবীকে খুন করে। আপনি তাকে সেন্টের শিশি দেন। বারান্দা থেকে আপনারা শিশিগুলো ভিতরে ছুঁড়ে ভেঙেছিলেন। তাতে আপনাদের গায়ে সুগন্ধ লাগতে পারেনি। আপনারা নিরাপদে পিছনের বাগানে নেমে পালিয়ে যান।

আমার মাথা ঘুরছে। প্লিজ, আর নয়।

আহা, এটা শুধু অনুমান। এটা একটা রিকনস্ট্রাকশন মাত্র। এরকম নাও হতে পারে।

তাহলে?

আমার ধারণা খুনের সময় মিঠু একাই ছিল। ঠিক কি না?

॥ ছয় ॥

আমাকে কেন টানা হ্যাঁচড়া করছেন? যা হয়েছিল হয়েছিল। পাস্ট ইজ পাস্ট। মিতালির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

লেখাপড়া কতদূর?

মাধ্যমিক।

তাহলে তো তোমাকে শিক্ষিতই বলতে হয়। পাশ করেছিলে?

জি।

কোন ডিভিশনে?

বললে বিশ্বাস করবেন? বলে কী লাভ?

শুনিই না।

ফার্স্ট ডিভিশনে।

বলো কী!

অঙ্কে আর ইতিহাসে লেটার ছিল।

উরেব্বাস।

জানতাম বিশ্বাস করবেন না। তবে সার্টিফিকেট আর মার্কশিট দুটোই আমার মায়ের কাছে আছে। মা ঠাকুরের আসনে তোশকের তলায় রেখে দিয়েছে।

পড়াশুনো আর এগোয়নি?

না। পড়ে কী হবে?

কলেজে ভর্তি হয়েছিলে?

তাও হয়েছিলাম। তবে কন্টিনিউ করিনি।

কেন?

পড়াশুনো ফালতু জিনিস। পড়ে উন্নতি করতে গেলে লোকে বুড়ো হয়ে যায়। অত সময় কি হাতে আছে?

বটে। তা তুমি কিসে উন্নতি করতে চেয়েছিলে?

মাল-টাল বেচতাম।

কী মাল ?

সে সব স্যার, পুরোনো কাসুন্দি। ও ঘেঁটে লাভ নেই। এই কেসটায় ঝুটমুট আমাকে ধরেছেন।

সেটা দেখা যাবে। মিতালিকে চিনতে ?

চিনব না কেন ? সে আমার বউ ছিল।

বিয়ে হয়েছিল ?

কালীঘাটে।

রেজিস্ট্রি হয়নি ?

না। ও তখন মাইনর ছিল।

তাও তো বটে। কতদিন একসঙ্গে ছিলে ?

পাঁচ ছয় মাস হবে।

তুমি ওকে মারধোর করতে ?

না। মারব কেন ? তখন আশনাই চলছিল।

আশনাই কেটে গেল কেন ?

মিতালিই বিগড়ে গেল। ওয়ান ফাইন মর্নিং ঘুম থেকে উঠে বলল, আমি ফিরে যাচ্ছি।

তুমি কী করলে ?

কী করব ! হাই তুলে পাশ ফিরে শুলাম।

আটকাবার চেষ্টা করলে না ?

কী লাভ ! ভদ্রলোকের মেয়ে, একটু টক-ঝালের খোঁজে এসেছিল। টেঁকার বিয়ে নয়, জানতাম।

তোমার জন্য ওর জীবনটা বরবাদ হয়ে গিয়েছিল, জানো ?

কেন স্যার, আমি কী করলাম ? আশনাই তো আমি একা করিনি। ওরও ভূমিকা ছিল।

কোথায় বাসা করে ছিলে ?

গোবিন্দপুর বস্তিতে।

পরে মিতালি দেবীর খোঁজ খবর করোনি ?

খোঁজার কী আছে স্যার ? পাড়ারই মেয়ে। সব খবরই পেতাম।

বটে ! মিতালি দেবীর যে বিয়ে হয়েছিল, উনি যে আমেরিকায় ছিলেন সব জানতে ?

ঘ্যাম মেয়ে। সব জানতাম।

তোমার হিংসে হত না ?

না স্যার। হিংসে-ফিংসে হয়নি। ওসব মেয়ে কি আমার মতো লোকের জন্য ? শখ হয়েছিল, তাই কেটে এসেছিল। তারপর শখ মিটে গেলে কেটে গেল।

মিতালি যে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছিল তা জানতে ?

কেন জানব না ? বরুণবাবু মারা গেলেন তাও জানি।

তুমি কী করো ? চাকরি ?

কিছুদিন করেছিলাম। ব্যাংকে ধোয়ামোছার কাজ। ক্যাজুয়াল স্টাফ। পোষাল না। ধুপকাঠি, লজেন্স, গেঞ্জি-আন্ডারওয়্যার এসবও বেচেছি। কিন্তু সৎপথে কিছু হল না। এখন টুকটাক করি আর কী।

অসৎ পথে ?

পুলিশ সব জানে স্যার। নতুন কিছু নয়।

মিতালি দেবীর সঙ্গে এবার তোমার দেখা হয়েছিল ?

হাসালেন স্যার। মিতালি আমাকে পাত্তা দেবে কেন ? পাস্ট ইজ পাস্ট।

মিঠু মিত্রকে চেনো ?

মিতালির হাজব্যান্ড তো ! চিনি স্যার।

কীরকম চেনো ?

খুব ভাল লোক স্যার। ট্যাক্সির জন্য লোনটা তো উনিই বের করে দিয়েছিলেন ?

তোমার ট্যাক্সিও আছে নাকি ?

ছিল স্যার। গত মাসে বেচে দিয়েছি।

মিঠু মিত্র তোমাকে চিনত ? মানে তোমার সঙ্গেই যে মিতালি পালিয়ে গিয়েছিল তা জানত ?

কেন জানবেন না ?

জেনেও তোমাকে হেল্প করেছেন ?

হ্যাঁ, জেনেই করেছেন। মিতালি তো দুজনের কাছ থেকেই ভেগেছে স্যার। আমরা লড়ে কী করব ?

মিঠু মিত্র তাহলে তোমার মতে ভাল লোক ?

জি।

তুমি জি বলছো কেন ?

হিন্দি ছবিতে বলে, তাই এসে যায়।

ধরো যদি তোমাকে বলি, মিঠু মিত্র কোনও কাজ করতে বললে তুমি করবে ?

করব স্যার।

যদি একটা খারাপ কাজ করতে বলে ?

খারাপ নানা রকমের হয়। ভদ্রলোকের চোখে খারাপ, পুলিশের চোখে খারাপ, কেরানির চোখে খারাপ। সব খারাপই তো একরকম নয় স্যার। ওজন করে দেখতে হবে।

তুমি তো ফিলজফার দেখছি।

জি।

পড়াশুনো করলে উন্নতি করতে পারতে।

পাস্ট ইজ পাস্ট। ছেড়ে দিন।

ছাড়লাম। নিশ্চয়ই জান যে, মিতালি দেবী খুন হয়েছে।

জানি। স্যাড কেস।

কীভাবে জানলে ?

সবাই জানে। আমার না জানার কী ?

ঠিক কথা। কীভাবে খুন হয় ?

স্ট্যাবিং।

আচ্ছা, তুমি যখন মিতালিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে তখন বরুণ ঘোষ কি পুলিশে রিপোর্ট করেছিলেন ?

হ্যাঁ স্যার।

পুলিশ তোমাকে অ্যারেস্ট করেছিল ?

করেছিল। মিতালি চলে আসার পর।

তোমার কি জেল হয়েছিল ?

না। জামিন পেয়েছিলাম। পুলিশ কেসটা পারস্যু

করেনি।

কেন করেনি?

বরুণবাবু বোধহয় পাবলিসিটির ভয়ে পিছিয়ে যান।

পুলিশ তোমাকে মারধোর করেছিল?

জি।

তোমার রাগ হয়নি?

না স্যার। কার ওপর রাগ করব? আমাদের লাইফটাই এরকম।

মিঠু মিত্রের সঙ্গে তোমার দোস্তি কীভাবে হয়েছিল?

ঠিক মনে নেই।

একটু ভেবে বলো। ব্যাপারটা জরুরি।

যতদূর মনে আছে উনি আমাকে খুঁজে বের করেছিলেন।

সেটা কি ওঁদের বিয়ের আগে, না পরে?

বিয়ের পর।

কতদিন পর?

মিতালি ওকে ছেড়ে চলে আসার পর।

মিঠু মিত্র তোমাকে খুঁজে বের করেছিলেন কেন?

ওঁর একটা রং আইডিয়া ছিল।

কীরকম?

উনি ভেবেছিলেন আমি মিতালিকে পিছন থেকে ফুসলাচ্ছি, তাই মিতালি ওঁর সঙ্গে থাকতে চায় না।

উনি কি তোমাকে থ্রেট করেছিলেন?

না স্যার।

তাহলে?

উনি আমাকে খুব ঠেঙিয়েছিলেন।

বলো কী? তোমার গায়ে হাত! তুমি তো মস্তান!

জি। তবে বাবারও বাবা থাকে কিনা। উনি তখন রেগে বয়লার হয়ে গিয়েছিলেন।

তুমি উল্টে মারোনি?

ক্যারাটে কুংফুর সঙ্গে কি পারা যায়?

তোমার দলবল?

দু-চারজন দোস্ত একটু হাত-পা চালিয়েছিল। সুবিধে হয়নি।

তারপর?

তারপর উনি ভুল বুঝতে পারেন।

তারপরই দোস্তিটা হয়ে গেল?

অনেকটা সেরকমই। একটু সময় লেগেছিল।

দোস্তিটা কি এখনও আছে?

একটু আছে। দেখা হলে উইশ করি।

মিঠুর সঙ্গে লাস্ট কবে তোমার দেখা হয়েছে?

ঠিক মনে নেই।

ভেবে বলো।

ওইরকমই সময়েই হবে।

কোনরকম সময়ে?

মিতালির মার্ডারের দিনের কাছাকাছি।

নাকি ওই দিনই?

তাও হতে পারে।

কখন দেখা হয়েছিল?

বিকেলের দিকে।

কীভাবে?

আমি মন্টুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উনি মোটরবাইকে করে চলে যাচ্ছিলেন।

তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল কি সেদিন?

না। উনি দেখতে পাননি আমাকে।

তুমি তো নিশ্চয়ই জানো যে, মার্ডারটা হয়েছিল দোতলায়, মিতালি দেবীর শোয়ার ঘরে। রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে।

জি। সব জানি। খবরের কাগজে পড়েছি।

এ পাড়ায় নাইট গার্ডরা রাতে পাহারা দেয়।

জি। আমিও দিই। বহুত চোর ছ্যাঁচড় চারদিকে।

সেই রাতে তোমারও কি ডিউটি ছিল?

না স্যার। আমাদের মাসে দু' দিন টার্ম আসে। তবে

নাইট গার্ডরা সেদিন রাতে কোনও কিছু সন্দেহজনক দেখেনি।

তুমি সেদিন কোথায় ছিলে?

ঘরেই ছিলাম।

তোমার কোনও গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে?

ওরকমই ধরে নিন।

তদন্তে কিন্তু তাকেও দরকার হতে পারে। তার নাম ঠিকানা বলো।

ঠিকানা-ফিকানা জানি না স্যার। নাম বলেছিল রীতা দাস।

কীরকম মেয়ে? প্রস্টিটিউট না কল গার্ল?

একটু অন্যরকম।

কীরকম?

একটু হায়ার ক্লাসের।

তোমরা কোথায় ছিলে?

পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাড়ির পিছন দিকে আমার ঠেক। সেখানেই ছিলাম।

মেয়েটা কোথায়?

নেই। পরদিন সকালে উঠে দেখি, হাওয়া।

হাওয়া? তোমাকে বলে যায়নি?

না স্যার। রাত্তিরে আমার ঘুমটা একটু গাঢ় হয়। টের পাইনি।

তার সঙ্গে কবে তোমার প্রথম দেখা হয়?

দু' দিন আগে।

কীরকম ভাবে দেখা হয়েছিল?

আমি একটু আধটু ড্রিংক করি। একটা দিশি মদের আস্তানায়। সেখানেই।

কে আলাপ করেছিল? তুমি না ও?

মেয়েটাই।

বারটা কোথায়?

বার নয় স্যার, ঠেক। কাছেই, ভবানীপুরে।

তাকে আগে কখনও দেখেছ ?

না।

একটু ছোটখাটো ছিপছিপে চেহারা কি ?

হ্যাঁ। আপনি চেনেন স্যার ?

চিনি বলেই মনে হচ্ছে। এবার খুব ভাল করে ভেবে জবাব দাও। সেদিন— অর্থাৎ মিতালি দেবীর খুনের দিন তুমি কখন ড্রিংক করতে শুরু করেছিলে ?

রাত আটটার পরই সাধারণত আমি খাই।

ঘরে বসে খাচ্ছিলে ?

হ্যাঁ।

মেয়েটাও খাচ্ছিল কি ?

একটু আধটু।

কখন শুতে গিয়েছিলে ?

ঘড়ি দেখিনি। তবে সেদিন মালটা বেশি টেনে ফেলেছিলাম স্যার।

সময়টা বলতে পারবে না ?

বোধহয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রীতা একটা পাঞ্চ তৈরি করেছিল। দারুণ জিনিস।

পাঞ্চ ?

হ্যাঁ। দু' তিনরকম মদ মিশিয়ে।

* * *

যে লোকটা দরজা খুলল সে একজন চিনেম্যান চেহারার লোক। বেশ স্বাস্থ্যবান। শবর তার দিকে দু' সেকেন্ড চেয়ে রইল।

হু ডু ইয়া ওয়ান্ট ?

এটা কি তোমার ঘর ?

অফ কোর্স।

এখানে রীতা দাস বলে কেউ থাকে ?

নো। আই লিভ অ্যালোন।

জুলেখা শর্মা বলে কেউ ?

নো। হু দি হেল আর ইউ ?

পুলিশ ইন্টেলিজেন্স।

মাই গড ! কাম ইন।

ঘরে ঢুকে শবর চারদিকে চেয়ে দেখে নিল। বোর্ডিং হাউসের ঘর যেমন হয় তেমনই। দশ বাই বারো মাপেরই হবে। দেয়ালে খুব চড়া রঙের ওয়ালপেপার লাগানো। একটা সরু খাট, টেবিলের ওপর একটা স্টিরিওতে মাইকেল জ্যাকসনের ক্যাসেট বাজছে, একটা ওয়ার্ডরোব এবং নিত্য ব্যবহার্য কিছু জিনিস। একটা লোহার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, প্লিজ সিট ডাউন।

তোমার বয়স কত ?

থার্টি সিক্স।

ম্যারেড ?

নট ইয়েট। নো মানি টু ম্যারি।

কী করো ?

এলিট সিনেমার গলিতে আমার ব্যাগ তৈরির কারখানা আছে। এ ভেরি স্মল এন্টারপ্রাইজ।

তুমি ইন্ডিয়ান সিটিজেন ?

অফ কোর্স !

এ ঘরে কত দিন আছ ?

লাস্ট টেন ইয়ার্স।

রীতা দাস বা জুলেখা শর্মা নামের কোনও মেয়েকে চেনো ?

না।

এ ঘরে কোনও মেয়ে আসে ?

না না। ওসব এখানে হয় না।

তাহলে কোথায় হয় ?

ইফ আই নিড এ গার্ল আই গো টু হার।

থ্যাংক ইউ।

*　　*　　*

আপনার নাম ?

সুনীতা রায়।

আপনি এই স্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর ?

হ্যাঁ।

কতদিন এখানে কাজ করছেন ?

এগারো বছরেরও বেশি।

জুলেখা শর্মা বলে কেউ এখানে কাজ করে না বলছেন ?

না। কোনওদিন নয়।

ছোটখাটো ছিপছিপে চেহারা, পুলিশ অফিসারের নাতনি।

না। এরকম কেউ এখানে কাজ করে না।

আপনাদের সব স্টাফ আজ উপস্থিত আছেন কি ?

হ্যাঁ। ফুল স্টাফ।

আমি তাঁদের দেখতে পারি কি ?

পারেন। তবে অনেকে এখন ক্লাসে আছেন।

আমি অপেক্ষা করব।

ও.কে.।

*　　*　　*

নমস্কার জয়িতা দেবী।

নমস্কার।

আমাকে দেখে আপনি বোধহয় খুশি হননি! পুলিশের দুর্ভাগ্য, তাদের দেখে কেউ খুশি হয় না।

না না, আপনি তো আপনার কাজ করছেন। বসুন।

আজ খুব বেশি জেরা করার নেই। শুধু দু' একটা প্রশ্ন।

বলুন।

মিতালি দেবীর ঘর থেকে খুনের রাতে কিছু জিনিস খোয়া যায়।

জানি। শুনেছি।

অনেক সময়ে খুনি তার মোটিভ ঢাকতে চুরিটা সাজিয়ে নেয়। আমাদের অ্যাঙ্গেল অফ এনকোয়ারিতে তাই আমরা চুরিটাকে গুরুত্ব দিইনি। উনি কলকাতা কাস্টমসে যে ডিক্লেয়ারেশন দিয়েছিলেন তাতে দেখছি উনি সঙ্গে মাত্র দুশো ডলার এনেছিলেন। একটা হার আর বালা ছাড়া সোনাদানাও বিশেষ ছিল না। ওঁর সব গয়না আমেরিকায় এবং কলকাতায় ব্যাংকের লকারে আছে। সুতরাং চুরির পরিমাণ বেশি নয়। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন ?

পারি। মিতালিদির হ্যান্ডব্যাগে দশ হাজার ডলার ছিল।

দশ হাজার ? বলেন কী ?

টাকাটা উনি আমাকে দেখিয়েছিলেন।

সেই হ্যান্ডব্যাগটায় আর কী ছিল ?

কয়েকটা গয়না।

অত ডলার উনি এনেছিলেন কেন জানেন ? বিশেষ করে যখন এখানেও ব্যাংকে ওঁর প্রচুর টাকা রয়েছে ?

জানি। মিতালিদি একটু অগোছালো টাইপের। একটু আনমনাও। ভারতবর্ষে আসার সময়ে, প্লেন ধরার আগে বাড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে ও দেখতে পায়, বিছানায় বালিশের তলায় ডলারের গোছাটা পড়ে আছে। টাকাটা ফেলে এলে চুরি যাওয়ার ভয় ছিল। তাই তাড়াতাড়িতে হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়। হ্যান্ডব্যাগটা কি চুরি গেছে ?

না। তবে ডলার আর গয়না চুরি হয়েছে।

ইস, অনেক টাকা, না ?

হ্যাঁ। চুরির অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা এখন একটু গুরুত্ব দিচ্ছি। আপনার কি মনে পড়ে, মিতালি দেবী দেশে আসার পর কোনও মেয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি না ?

অনেক মেয়ে এসেছিল। ওর বান্ধবীরা। রোজই তো আসত।

তাদের কথা বলছি না। বান্ধবী নয় এমন কেউ ?

আমি তো সবসময়ে বাড়িতে থাকতাম না।

ছোটখাটো ছিপছিপে চেহারার একটি মেয়ে ? মাজা রং ?

মনে পড়ছে না।
ভাল করে ভাবুন।
জয়িতা ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না। তবে—
তবে ?
একদিন একটা ফোন এসেছিল।
হ্যাঁ বলুন।
ফোনটা করেছিল একটা মেয়ে। আমিই ফোন ধরেছিলাম। মিতালিদিকে চাইছিল বলে আমি ওকেই ফোনটা দিই। অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। মিতালিদি ফোনটার পর খুব রেগে গিয়েছিল। আমাকে বলল, কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার বল তো ! এ তো ব্ল্যাকমেল !
বটে ? আপনি জানতে চাননি কে ফোনটা করেছিল ?
চেয়েছিলাম। মিতালিদি বলল, একটা বাজে মেয়ে। চিনি না। খারাপ খারাপ কথা বলছিল।
ব্যস ! আর কিছু নয় ?
না। ব্যাপারটা মিতালিদি তেমন পাত্তা দিল না। তবে খুব রেগে গিয়েছিল, এটা মনে আছে।

॥ সাত ॥

নমস্কার।
মিঠু খুব ধীরে তার বিষণ্ণ মুখখানা তুলল। ব্যাংক এখন ফাঁকা। বেলা তিনটে বেজে গেছে। টেবিলের ওপাশে শবর দাঁড়িয়ে।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিঠু বলল, বসুন।
শবর বসল।
কেমন আছেন ?
মিঠু মৃদু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আছি।
আজ ঠিক জেরা করতে আসিনি।
তাহলে কি অ্যারেস্ট করতে ?
এখনই নয়। আমি আরলি অ্যারেস্টে বিশ্বাসী নই। বরং

সন্দেহভাজনকে নড়াচড়া করতে দিলে এবং নজর রাখলে ভাল কাজ হয়।

তাই বুঝি। বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্য।

আমার জন্য নয়, দেশ ও দশের জন্য। আমার একটা ইনফর্মেশন চাই।

কিসের ইনফর্মেশন ?

রিগার্ডিং বরুণ ঘোষ।

অনেক কথাই তো হয়েছে।

মাথা নেড়ে বলল, তাহলেও অনেক কিছু জানা যায়নি।

কী জানতে চান ?

গত দু' তিন বছর ধরে ওর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে উইথড্রয়ালের পরিমাণ হঠাৎ অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল কি না।

ওঁর অ্যাকাউন্ট চেক না করে তো বলা যাবে না।

চেক করুন।

করছি। আর কিছু ?

হ্যাঁ। উনি কেমন লোক ছিলেন ?

সে কথা তো বলেইছি।

লোনলি, উইডোয়ার, মিডল এজেড ?

হ্যাঁ।

শবর একটু হাসল। তারপর বলল, যতদূর জানি মিতালি দেবীর দু' বছর বয়সের সময় বরুণবাবুর স্ত্রী মারা যান।

হ্যাঁ।

তখন ওঁর দ্বিতীয়বার বিয়ে করার বয়স ছিল।

হ্যাঁ।

উনি মারা গেছেন চুয়ান্ন বছর বয়সে।

তা হবে।

বয়সটা খুব বেশি নয়, কী বলেন ?

আপনি একটা কিছু ইঙ্গিত করতে চাইছেন।

হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন কি ?

না। আন্দাজ করছি।

তাহলে স্পষ্ট করেই বলি। ওয়াজ দেয়ার এ উওম্যান সামহোয়ার ?

আমি ঠিক জানি না।

একটু ভাবুন। আপনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। আপনি তাঁর অ্যাকাউন্ট হ্যান্ডেল করেছেন।

মিঠু ভ্রূ কুঁচকে খানিকটা চুপ করে রইল।

শবর বলল, বলতে আপনার রুচিতে বাধছে কি ?

তা নয়।

তাহলে ?

এটুকু বলতে পারি যে, সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আচ্ছা, উনি কি সবসময়ে নিজেই টাকা তুলতে আসতেন ?

না। মাঝে মাঝে ওঁর রান্নার লোক হরেন বা ড্রাইভারও আসত।

আর কেউ ?

ন্‌না।

দেখুন, কেসটা সিরিয়াস একটা টার্ন নিচ্ছে। এ সময়ে দ্বিধা করলে আমরা মুশকিলে পড়ব। ভাল করে ভেবে দেখুন।

দেখুন, বেয়ারার চেক তো যে-কাউকেই দেওয়া যায়। উনি অনেককেই হয়তো চেক পেমেন্ট করতেন। সব মনে রাখা কি সম্ভব ?

না। তবু কোনও অস্বাভাবিকতা ঘটে থাকলে সেটা মনে থাকতে পারে।

কিছু মনে পড়ছে না।

আচ্ছা, উনি কি অনেককেই চেক পেমেন্ট করতেন ?

যতদূর মনে আছে, না।

ওঁর আরও তিনটে ফিকটিশাস অ্যাকাউন্ট আছে।

সে তো আপনি জানেন।

এই তিনটে অ্যাকাউন্ট থেকে উনি টাকা তুলতেন কি ?

খুব কম।

মনে করে দেখুন তো, কখনও এ তিনটের কোনও একটা থেকে এমন কেউ টাকা তুলতে এসেছেন কি না, যে একটি মেয়ে, যার বয়স এখন বত্রিশ তেত্রিশ, ছিপছিপে, ছোটখাটো, আন ইমপ্রেসিভ চেহারা?

মিঠু একটু হাসল।

হাসলেন যে!

এই বিবরণটা আপনি আর একজনকেও দিয়েছেন।

হ্যাঁ। জয়িতা দেবীকে।

মনে পড়ছে না।

শুনুন মিঠুবাবু, মানুষের ব্রেন একটা অনন্ত স্টোরহাউস। তাতে সব জমা থাকে। ব্রেনটা একটু ট্যাপ করুন। চোখ বুজে মেডিটেট করুন।

মিঠু অসহায়ভাবে বলল, তার চেয়ে কমপিউটারের শরণাপন্ন হওয়াই বোধহয় ভাল।

গুড আইডিয়া। কম্পিউটার অবশ্য কোনও মুখশ্রী দেখাবে না। তবু ইট মে হেল্প টু রিমেম্বার।

টেবিলের একধারে রাখা মনিটরটা চালু করে কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে দেখল মিঠু। তারপর বলল, পিনাকী শর্মার অ্যাকাউন্ট থেকে রেগুলার উইথড্রয়াল হয়েছে।

অ্যামাউন্টটা?

প্রতি মাসে তিন হাজার।

সেল্‌ফ চেক?

হ্যাঁ, উনি আমেরিকায় যাওয়ার আগে একটা বড় উইথড্রয়াল দেখছি।

কত?

ছত্রিশ হাজার।

কী মনে হয়?

বুঝতে পারছি না।

টাকাটা উনি কাকে দিতেন?

আপনি যা সাজেস্ট করছেন তা মেনে নিতে পারলে ভাল

হত হয়তো। কিন্তু—

মনে পড়ছে না তো ?

না।

তাহলে আমি একটু সাজিয়ে দিই। বিয়িং এ উইডোয়ার উনি একটা শুকনো জীবন কাটাতেন। মেয়েটাকে মানুষ করতে হবে বলে এবং সৎ মায়ের ভয়ে বিয়েও করেননি। কিন্তু লাইফ হ্যাজ ইটস ডিম্যান্ড। সুতরাং একটু বেশি বয়সে, ধরুন লেট ফর্টিজ-এ উনি একজন কাউকে পিক আপ করেন। তাকে কখনও নিজের বাড়িতে জায়গা দেননি। কিন্তু রেগুলার তাকে ভিজিট করতেন। মাসে মাসে তাকে মাসোহারা দিতে হত। পিনাকী শর্মা নামটাই হয়তো মেয়েটাকে বলেছেন। মেয়েটাও এক জায়গায় নিজেকে জুলেখা শর্মা বলে পরিচয় দিয়েছিল।

এরকম হতেই পারে।

খুব নির্দোষ ব্যাপার বলছেন ?

তা বলিনি। তবে সারকামস্ট্যান্সেস মে কমপেল এ ম্যান—

হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক কথা। চেকগুলো কি সবই সেল্‌ফ চেক ?

দেখতে হবে।

দেখুন। তবে তাড়া নেই। মেয়েটাকে খুঁজে বের করাই এখন প্রথম কাজ।

* * *

হরেনবাবু, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

যে আজ্ঞে। বলুন।

আপনি কতদিন বরুণবাবুর বাড়িতে কাজ করছেন ?

তা পনেরো-ষোলো বছর হবে।

যখন আপনি কাজে ঢোকেন তখন তো বরুণবাবুর স্ত্রী বেঁচে নেই ?

আজ্ঞে না। তার কয়েকবছর আগেই মারা যান।

একটা কথার জবাব ভেবেচিন্তে দিন। বরুণবাবুর চরিত্র কেমন ছিল ?

আজ্ঞে, ভালই। চমৎকার মানুষ ছিলেন।

কিন্তু আমরা জানি গত কয়েক বছর হল বরুণবাবুর সঙ্গে একটি মেয়ের ঘনিষ্ঠতা হয়। মেয়েটিকে আপনি কখনও দেখেছেন ?

আজ্ঞে না।

আরও স্পষ্ট করে বলি, মেয়েটিকে বরুণবাবু এ বাড়িতে কখনও আনতেন না। হয়তো নিজের আসল পরিচয়ও দেননি। কিন্তু তিনি মেয়েটির কাছে যেতেন। আপনার কি মনে পড়ে গত কয়েক বছর যাবৎ বরুণবাবু মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটাতেন কি না।

তা কাটাতেন।

গত ক' বছর ধরে ?

হিসেব করিনি। সাত আট বছর ধরে হবে।

এবার খুব হিসেব করে জবাব দেবেন। মেয়েটি ছোটখাটো চেহারার, মাজা রং, ছিপছিপে, কিন্তু রুগ্ণ নয়। মেয়েটি কখনও রীতা দাস, কখনও জুলেখা শর্মা নামে পরিচয় দেয়।

নাম জানি না, তবে আপনি যেমন বলছেন তেমন একটা মেয়ে বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিল।

কবে ?

বাবু আমেরিকা যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে। দিদিমণি চলে যাওয়ার পর এ বাড়িতে মেয়েছেলে বড় একটা আসে না। তাই এ মেয়েটিকে দেখে একটু ধন্দ লেগেছিল।

কেন এসেছিল ?

তা জানি না। বাবুর খোঁজ করাতে আমি তাকে ঘরে বসিয়ে বাবুকে খবর দিই।

ওঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল জানেন ?

না। তবে বাবু যে মেয়েটিকে দেখে রেগে গিয়েছিলেন তা দূর থেকেও চেঁচামেচি শুনে বুঝেছি। বলতে ভুলে গেছি,

মেয়েটার সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলেও ছিল।

ছেলে! কত বড় ছেলে?

চার পাঁচ বছর হবে।

বরুণবাবু চেঁচিয়ে কী বলেছিলেন মেয়েটাকে?

একটা দুটো কথা শুনেছি। একবার বললেন, এখানে আসার দরকার ছিল না। আর একবার যেন বললেন, টাকা কি গাছে ধরে?

আর কিছু শোনেননি?

না।

মেয়েটাকে আর কখনও দেখেছেন?

হ্যাঁ।

কবে এবং কোথায়?

দিদিমণি যেদিন খুন হন তার দুদিন আগে।

কোথায়?

ফটকের বাইরে।

কী করছিল?

চেয়েছিল। আমি বাজারে বেরোনোর সময়ে মুখোমুখি পড়ে যাই। কী চায় জিজ্ঞেস করায় বলল, কাজ খুঁজছে। আগে একবার দেখেছিলাম, তাই চেনা-চেনা ঠেকছিল।

সঙ্গে ছেলেটা ছিল?

না।

কীরকম কাজ খুঁজছে বলল?

সে কথা আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল গভর্নেস বা আয়া। আমি বললাম এখানে হবে না। তখন চলে গেল। চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ বাদে কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল যে এই মেয়েটাই বাবুর কাছে একবার এসেছিল।

এ বাড়িতে সে ঢোকেনি, ঠিক জানেন?

না।

মিতালি দেবীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেনি?

আমার তো চোখে পড়েনি। তবে আমাকে তো বাজার

হাট রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। নয়নের মা বলতে পারবে হয়তো।

সে কে?

কাজের মেয়ে। ডেকে দিচ্ছি।

নয়নের মা রোগা, কালো, মধ্যবয়স্কা। খুব পান খায়। সব শুনে-টুনে বলল, এসেছিল।

কবে?

ওই সব্বোনেশে ব্যাপার যেদিন হয় তার আগের দিন দুপুরে। দিদিমণি তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল?

না। মেয়েটা নীচের ঘরে বসেছিল। দিদিমণি নেমে এসে দেখা করলেন। দু-চারটে কথার পরই ওপর থেকে শুনলাম দিদিমণি চিৎকার করে উঠলেন, বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও!

আপনি চেঁচামেচি শুনে নেমে এলেন না?

না। ঝাড়পোঁছ করছিলাম। ভাবলাম সাহায্য-টাহায্য চাইতে এসেছে। কত লোকই তো আসে।

দিদিমণি কিছু বলেছিলেন আপনাকে?

না। একটু থমথমে মুখ করে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে গেল।

আর কিছু মনে পড়ছে?

না।

মেয়েটা ধমক খেয়ে উল্টে কিছু বলেছিল?

না। আমি দোতলা থেকে দেখলাম গটগট করে বেরিয়ে গেল।

পোশাকটা মনে আছে?

সাদা চুড়িদার।

* * *

আই অ্যাম ডিস্টার্বিং ইউ। কিন্তু কেসটা সিরিয়াস।

কাজেই—

ইটস ও.কে. অফিসার। হাউ ক্যান উই হেল্‌প ইউ ?

আমি একটি ছেলের সন্ধান করছি। এখন তার বয়স হবে ছয় সাত। নাম জানি না। কিন্তু পদবিটা শর্মা হলেও হতে পারে। বাবার নামও জানি না। তবে দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি যে, বাবার নাম পিনাকী শর্মা। আপনাদের রেকর্ডটা কনসাল্ট করবেন ?

নো প্রবলেম। আপনি বসুন, আমি আসছি।

হেড মিস্ট্রেস উঠে গেলেন। শবর বসে রইল। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। তবু লেগেও যায় অনেক সময়ে। মেরিজ স্কুল নামটা যখন জুলেখার মুখে এসেছে তখন হলেও হতে পারে, ওর ছেলে এই স্কুলে পড়ে।

হেড মিস্ট্রেস পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। মুখে একটু উদ্বেগ।

ইয়েস অফিসার, ক্লাস টু-তে দুজন শর্মা আছে। টুইন ব্রাদার্স। কিন্তু ওদের বাবার নাম সুজিত শর্মা, এ মার্চেন্ট। মিস্টার শর্মা পেরেন্টস মিটিং-এ আসেন, আমরা তাঁকে চিনি।

শবর মাথা নেড়ে বলল, না, এরা নয়।

দেন উই আর সরি।

শবর উঠতে যাচ্ছিল। তারপর মাথায় বজ্রাঘাতের মতো একটা কিছু চমকে গেল তার। কী বোকা সে !

ম্যাডাম।

ইয়েস অফিসার।

আই অ্যাম মেকিং এ মেস অফ থিংস। কিন্তু দয়া করে আমাকে আর একটা ইনফর্মেশন দিন।

বলুন।

ছেলেটার পদবি সম্ভবত ঘোষ। বাবার নাম বরুণ ঘোষ।

নিশ্চয়ই। বসুন, আমি চেক করে আসছি।

পনেরো মিনিট যেন পনেরো ঘণ্টার মতো কাটল। হেড মিস্ট্রেস ফিরে এলেন।

ইয়েস অফিসার। হি ইজ ইন ক্লাস টু। প্রীতীশ ঘোষ।

বাবা বরুণ ঘোষ, মা দোয়েল ঘোষ। ঠিকানা টুয়েন্টি এ বাই সিক্স হরিশ চ্যাটার্জি বাই লেন।

শবর চিরকুটটা পকেটে রেখে বলল, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম।

ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।

* * *

দরজা খুলল সেই মেয়েটাই। তাকে দেখে একটুও চমকাল না। চোখে চোখ রেখে একটু চেয়ে রইল। তারপর দরজাটা ছেড়ে দিয়ে বলল, আসুন।

চিনতে পারছেন?

পারছি। জানতাম আপনি আসবেন।

গলির মধ্যে একটা পুরনো বাড়ির একতলার ছোট্ট বাসা। ভিতরটা অপরিচ্ছন্ন নয়। বরং বেশ তকতকে ঝকঝকে। একটা ডিভান আছে, দুটো বেতের চেয়ার, কাচের শো-কেস-এর ওপর একটা রঙিন টিভিও। পাশে ভি সি আর। এটা স্পষ্টতই বাইরের ঘর। ভিতরে একখানা শোয়ার ঘরও আছে। শবর বেতের চেয়ারটায় বসল।

জুলেখা পর্দা সরিয়ে ভিতরে গেল। দু মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল।

বসুন। কথা আছে।

জুলেখা ওরফে রীতা ওরফে দোয়েল ডিভানটায় বসল। একটু জড়োসড়ো।

আপনার আসল নামটা কী?

দোয়েল।

বরুণ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় কবে হয়েছিল?

প্রায় নয় বছর আগে। উনি নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলেন একটা চেক আপের জন্য। ব্রংকিয়াল কারসিনোমা সাসপেক্টেড। খুব অসুস্থ ছিলেন। আমি তখন ওখানে আয়া ছিলাম।

তখনই ঘনিষ্ঠতা হয়?

হ্যাঁ। উনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন, আমিও ওঁকে।

অ্যান্ড দ্যাটস দ্যাট ?

তখন আমার বয়স চব্বিশ-টব্বিশ। ওঁর মিড ফর্টিজ। উইডোয়ার। উই ফেল্ট ফর ইচ আদার।

তারপর ?

উনি ভাল হয়ে গেলেন। ক্যানসার হয়নি।

তখন ওঁর মেয়ের বিয়ে কি হয়ে গেছে ?

অসুখের পরই মেয়ের বিয়ে হয়, ডিভোর্স হয়, মেয়ে চলে যায় আমেরিকায়। তখন ভীষণ লোনলি। আমাকে ওঁর খুব দরকার হত।

বন্দোবস্তটা কীরকম ছিল ?

উনি এ বাড়ির এই অংশটা লিজ নিয়েছিলেন আমার নামে। দশ বছরের লিজ। মাসে মাসে দু হাজার টাকা মাসোহারা দিতেন।

এখানেই আপনাদের দেখাসাক্ষাৎ হত ?

হ্যাঁ।

এর আগে আপনি কোথায় থাকতেন ?

আমার মায়ের সঙ্গে, মোমিনপুরে।

আপনার মা এখনও সেখানে আছেন ?

না। মারা গেছেন।

সেই বাড়িটা ?

ওটা ভাড়া বাড়ি। আমার দাদা থাকে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।

আপনি ইংরিজি বলা কোথায় শিখলেন ?

স্কুলে। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল। বাবা চাকরি করতেন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে। তিনি মারা যাওয়ার পর আমরা ভীষণ খারাপ অবস্থায় পড়ি। পড়াশুনো ছাড়তে হয়, চাকরি নিতে হয়। তাও আয়ার চাকরি এবং ক্যাজুয়্যাল। দাদা বাড়ি থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। তারও অবশ্য অবস্থা খারাপ ছিল।

বরুণবাবুকে আপনি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ?

বহুবার।

বিয়ে হল না কেন?

উনি লোকনিন্দার ভয় পেতেন। একবার রাজি হতেন, আবার নানা টালবাহানা করে পিছিয়ে যেতেন।

বিয়ে না করেই সন্তান হল?

হ্যাঁ। উনি অ্যাবোরশন করাতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি। ভেবেছিলাম বাচ্চা হলে হয়তো বিয়েতে রাজি করাতে পারব।

উনি রাজি হননি?

না। ওই তো বললাম, খুব দোনোমোনো করতেন। আমি ওঁর ছেলের মা, আমি ভীষণ ইনসিকিউরিটি ফিল করতাম।

উনি টাকাপয়সা দিয়ে কমপেনসেট করতে পারতেন তো!

টাকা পয়সার ব্যাপারে উনি খুব উদার ছিলেন না। উনি যা দিতেন তাতে চলত না। ছেলে হওয়ার পর খরচ তো বেড়েছিল। বিয়ের জন্য চাপ দিতাম বলে উনি ক্রমে ক্রমে আমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন।

আমি আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। উনি কি ছেলেকে ভালবাসতেন?

বাবা যেমন ছেলেকে ভালবাসে তেমন নয়। তবে বোধহয় মায়া একটু ছিল। আদর-টাদর করতেন।

তারপর কী হল?

উনি মেয়ের কাছে আমেরিকায় গেলেন। এক বছরের জন্য। আমাকে মাত্র কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ছেলের স্কুলের বেতনই মাসে দেড়শ টাকা। আরও খরচ আছে। আমি ফের আয়ার চাকরি শুরু করেছিলাম। কিন্তু বাজার খারাপ। আয় সামান্যই হত।

আপনি কি ওঁকে ব্ল্যাকমেল করতেন?

ব্ল্যাকমেল! না। কথাটা তখন মাথায় আসেনি।

উনি একটা ডায়েরিতে ব্ল্যাকমেল করার কথা লিখে গেছেন। অবশ্য তাতে আপনার নাম নেই।

ব্ল্যাকমেল নয়। তবে উনি আমেরিকা যাওয়ার আগে অনেকদিন আমার কাছে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। আমি ভয় পাচ্ছিলাম উনি হয়তো আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। বাধ্য হয়ে আমি ওঁর কাছে যাই। ওঁর বাড়িতে যাওয়া বারণ ছিল আমার। বাধ্য না হলে যেতাম না। আমার একার জন্য তো নয়, ছেলেটাকে তো দেখতে হবে। উনি আমাকে দেখে খুব রেগে যান। আমি টাকা পয়সার কথা বলাতে উনি বলেন, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছ? এটা কি ব্ল্যাকমেল, আপনিই বলুন তো!

না। তারপর বলুন।

শেষ অবধি উনি কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

তারপর?

উনি আমেরিকা চলে যাওয়ার পর আর যোগাযোগ ছিল না। উনি আমাকে চিঠি লিখতেন না কখনও। আমার তো লেখা বারণই ছিল। এক বছর বাদে উনি ফিরে আসার পর আমার সঙ্গে দেখা করেন। দেখলাম খুব নরম হয়ে পড়েছেন। আমার প্রতি যেন একটা টানও হয়েছে। সেই দুর্বলতার সুযোগে আমি ফের বিয়ের কথা তুললাম। উনি নিমরাজি ছিলেন। তবে চিন্তা ছিল বিষয়সম্পত্তি নিয়ে। বিয়ে করলে প্রীতীশ ওর সম্পত্তির মস্ত ভাগীদার হয়ে দাঁড়াবে। সেটা উনি যেন খুব একটা পছন্দ করছিলেন না। তবে শেষ অবধি রাজি হয়েছিলেন। এমনকি ওঁর কথা মতো আমি একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সঙ্গেও যোগাযোগ করে নিয়মকানুন জেনে আসি। কিন্তু উনি হঠাৎ করে মারা যাওয়ায় সব ভেস্তে যায়।

মিতালি দেবীর সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করেছিলেন কি এসব কথা জানানোর জন্য?

হ্যাঁ। আর এক বছর পর এই বাড়ির লিজ শেষ হয়ে যাবে। আমার মাসোহারা বন্ধ। চাকরি থেকে হাতে টাকাপয়সা আসছে না। আমি কী করতে পারি বলুন তো! আমার ছেলে অবৈধ সন্তান আমি জানি, কিন্তু ধর্মত ওঁরই

সন্তান। ও কেন অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হবে ? সেইজন্য আমি প্রথমে ওঁকে টেলিফোনে সব খুলে বলার চেষ্টা করি। উনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আমাকে উল্টে গালাগাল করেন।

আপনি কলগার্লের জীবিকা কবে থেকে বেছে নেন ?

মাথা নিচু করে একটু চুপ করে থেকে দোয়েল মাথা তুলে বলল, উনি আমেরিকা যাওয়ার প্রায় সাত আট মাস পরে। কলগার্ল নয়। আমি নার্সিং হোম থেকেই একজন মধ্যবয়স্ক পেশেন্টের সঙ্গে তার বাড়ি যাই। সেখানেই শুরু। তবে ইচ্ছে হত না। বাধ্য হয়েই—

সমীরণ বা পাণ্টুর কেসগুলো কী ?

পাণ্টুর সঙ্গে এক রাত্রি ছিলাম। ফর অ্যাকসেস টু দ্যাট হাউস।

কী চেয়েছিলেন ?

শেষবার চেষ্টা করেছিলাম মিতালির কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেতে। ও আমাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তখন ঠিক করি, চুরি করব।

চুরির পক্ষে কি পার্টির দিনটাই প্রশস্ত ছিল ?

হ্যাঁ। অনেক লোকের ভিড়ে আমি ঢুকে যেতে পারব বলে বিশ্বাস ছিল।

পাণ্টু যে মিতালির প্রাক্তন প্রেমিক, জানতেন ?

জানতাম। বরুণবাবুর কাছে সব শুনেছি।

সমীরণের সঙ্গে কীভাবে এবং কেন জুটে গিয়েছিলেন ?

ক্ষণিকা—অর্থাৎ ওর গার্ল ফ্রেন্ডকে আমি অনেকদিন চিনি। কিছুদিন ওর বাচ্চার বেবি সিটিংও করেছি। ওই সময়ে আমি ওদের বাড়িতে ওর বাচ্চা রাখছিলাম। ক্ষণিকা সমীরণের ওপর রাগ করে চলে আসায় আমি ঠিক করি সমীরণের সঙ্গে থাকব। তাতে খানিকটা ইনফর্মড থাকা যাবে।

এবার আসল কথায় আসুন দোয়েল দেবী।

দোয়েল এই প্রথম একটু হাসল। হাসলে মুখখানা ভারী

সুন্দর দেখায়, লক্ষ করল শবর।

পার্টির রাতে আমি দোতলায় উঠি।

কীভাবে ?

পিছনের বাগান দিয়ে। খুব সোজা।

বলুন।

দোতলার ঘরে ঢুকে চারদিক খুঁজে হ্যান্ডব্যাগটা পেয়ে যাই।

রাত তখন কটা ?

সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে।

খুব রিস্ক ছিল না ?

ছিল।

তারপর ?

দশ হাজার ডলার ছিল। টাকাটা আর দুটো গয়না সরিয়ে ফেলি।

কিন্তু—

জানি আপনি কী শুনতে চান। কিন্তু আপনাকে হতাশ হতে হবে। রাত দশটার পর আর আমি ও বাড়িতে ছিলাম না। খুনটা আমি করিনি মিস্টার দাশগুপ্ত।

শবর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দোয়েলের দিকে।

দোয়েল চোখ সরাল না, সমানে সমানে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি আমার ছেলের স্বার্থে ওই অপরাধটুকু করেছি। চুরি বললে চুরি। আইন আমার পক্ষে নেই। কিন্তু ধর্মত ন্যায্যত আমার এবং আমার ছেলের কিছু পাওনা হয়। দশ হাজার ডলার এমন কিছু বেশিও নয়। বরুণবাবুর স্ত্রী হতে পারলে আমার পাওনা অনেক বেশি হতে পারত। আপনি কি আমাকে অ্যারেস্ট করবেন ?

আপনার অ্যালিবাই আছে ? খুনের সময়ে রাত একটা থেকে—

দুটোর মধ্যে ? ও সময়ে সবাই ঘুমোয়। কে সাক্ষী দেবে বলুন !

আপনি কোথায় ছিলেন ?

দোয়েল একটা শ্বাস ফেলে বলল, আপনাকে আবার হার মানতে হবে। কারণ আমার ফুলপ্রুফ অ্যালিবাই আছে।

কীরকম ?

সেই দিন দশ হাজার ডলার পেয়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। ফিরে এসে আমি পাশের ফ্ল্যাটের বউদির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করি। ওরা মাঝে মাঝে আমার ফ্ল্যাটে ভি সি আর-এ ছবি দেখতে আসে। সেই রাতে ওদের পুরো পরিবার আর আমি এই ঘরে বসে রাত এগারোটা থেকে ভোর চারটে অবধি দুটো বাংলা আর একটা হিন্দি সিনেমা দেখেছি। আপনি খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। আরও বলি, পাড়ার আরও দুটো মেয়েও সেই রাতে আমার ঘরে বসে ছবি দেখেছে। কোয়াইট এ ক্রাউড।

শবর মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি।

চুরির জন্য আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন, কিন্তু খুনের জন্য নয়। খুনিকে আপনার আরও একটু খুঁজতে হবে।

আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করছি না।

তাহলে ?

আমি আপনার সঙ্গে একটা বাণিজ্য করতে চাই। সিম্পল বার্টার।

কী বলুন।

লিভ এ ক্লিন লাইফ। যা করেছেন করেছেন, আর নয়।

দোয়েলের চোখ ভিজে গেল, কে নোংরা জীবন কাটাতে চায় বলুন ! যা করেছি ছেলের স্বার্থে, মা হয়ে। ছেলের জন্য মা সব পারে। পারে না, বলুন ! তবে আর নয়, কথা দিচ্ছি।

এবার আরও একটু কথা আছে। হয়তো আপনিই পারেন ধাঁধাটা কাটাতে।

॥ আট ॥

সে পালাতে পারবে না, জানত। তবু দৌড়োচ্ছিল, প্রাণপণে দৌড়োচ্ছিল গলি থেকে গলিতে। আরও গলিতে। এসব অলিগলি তার মুখস্থ, হাতের তেলোর মতো চেনা। কোনদিক দিয়ে বেরোতে হবে, সে জানে। পিছনে এক জোড়া, মাত্র এক জোড়া পা-ই দৌড়ে আসছে। শবর দাশগুপ্ত। লালবাজারের টিকটিকি। ওর কাছে পিস্তল আছে। ইচ্ছে করলেই চার্জ করতে পারে। করছে না। পিস্তল তার কাছেও আছে। ইচ্ছে করলে সেও চার্জ করতে পারে। করছে না। করে লাভ নেই।

তবু সে দৌড়োচ্ছে কেন ? পালাচ্ছে ? না, সে পালাতে চাইলে পারবে। কিন্তু তা নয়। সে দৌড়োচ্ছে নিজের হাত থেকে, নিজেকে ছাড়াতে। না, ঠিক বোঝা যাবে না। কেউ বুঝবে না। এই অবোধ্য জীবন তার কত কী কেড়ে নিয়েছে। তার কত কী চলে গেছে ভেসে সময়ের জলে।

সামনে ডানহাতে একটা কানা গলি। সে ডানদিকেই ফিরল। দৌড়োতে লাগল। তারপর সোজা গিয়ে ঠেকল দেয়ালটায়। থামল। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। দেয়ালে পিঠ রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সুনসান গলি। দূরে গলির মুখ। সেখানে শবর দাশগুপ্ত এসে দাঁড়াল। না, পিস্তলে হাত দেয়নি। দূর থেকে তাকে দেখল। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে আসতে লাগল তার দিকে। দুপুরের রোদ খাড়া হয়ে পড়েছে। শবরকে দেখাচ্ছে ছোটখাটো, পায়ের নীচে বেঁটে ছায়া।

সেও পিস্তলে হাত দিল না। ফালতু। এখন আর এসব করে লাভ কী !

শবর সামনে এসে দাঁড়াল, পালালে কেন ?

পালালে কি ধরতে পারতেন ?

খামোখা এতটা দৌড়োনোর মানে হয় না।

হয়। এত সহজে ধরবেন, একটু গা ঘামাবেন না, তা কি

হয় ?

শবর একটু হাসল, সহজে ধরেছি কে বলল ? অনেক চক্কর খেতে হয়েছে।

একটা কাজ করলেন, আপনার মতে ভাল কাজ, পরিশ্রম তো সার্থক।

তুমি তো বেশ কথা বলো !

পিস্তলটা চাইলেন না ?

না। তুমি আমাকে গুলি করবে না, জানি।

কেন করব না ?

তুমি বুদ্ধিমান বলে। আমাকে মারা যায় : কিন্তু সিস্টেমকে কি মারতে পারবে ? অতীতকে মারতে পারবে ? যা ঘটে গেছে তাকে মারতে পারবে ?

না।

তাই চাইনি। আমি হিরো নই, লজিক্যাল।

আপনিও বেশ কথা বলেন !

শবর একটু হাসল। মৃদু স্বরে বলল, মেয়েটাকে মারলে কেন ?

মেয়েটার মরাটা দেখলেন, আমার মরাটা লক্ষ করলেন না ?

শবর ম্লান একটু হাসল, তাও দেখছি।

আমি কবে মরে গেছি জানেন ? আরও দশ বছর আগে।

শবর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আপনি কি বিশ্বাস করেন স্যার, আমি পালাচ্ছিলাম ?

না। পালাতে চাইলে তুমি এই কানাগলিতে ঢুকতে না। কিন্তু তুমি পালালে আমি খুশি হতাম।

সে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে শবরের দিকে চেয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল। দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। কিছুক্ষণ সময় লাগল সামাল দিতে। তারপর মুখের ঢাকা খুলে তার তীব্র চোখ দুখানা শবরের চোখে স্থাপন করে বলল, লোকে জানে, আমি মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়েছিলাম, লোকে জানে আমি ওকে নষ্ট করেছি। পুলিশ আমাকে এমন মারল, যে, একটা কিডনি নষ্ট

হয়ে গেল। অপটিক নার্ভ জখম হয়ে আমার বাঁ চোখ হয়ে গেল কমজোরি, ভবিষ্যতে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ও থেকে গেল। আমার সেকসুয়াল আর্জ চলে গেল। তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতি হল, আমার পড়াশুনার। আমার ক্যারিয়ারের। মায়ের কাছে আমার মার্কশিট আছে স্যার। দেখে নেবেন।

দেখতে হবে না। বোর্ডে গিয়ে তোমার মার্কশিটের রেকর্ড আমি চেক করেছি।

স্তিমিত চোখে চেয়ে বলল, কী হল স্যার ? বস্তিতে থাকি, গরিবের ছেলে, ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছিলাম, আমার সামনে ব্রাইট ফিউচার খুলে গিয়েছিল। কিন্তু কী হল স্যার ? কী হল বলুন ! এই মার্কশিট ধুয়ে কি জল খাব ?

তুমি তখন মস্তানি করতে ?

মস্তানি কি খারাপ স্যার, যদি তার পিছনে মর‍্যালিটি থাকে ? ব্যায়াম করতাম, খেলাধুলোয় ভাল ছিলাম, গায়ে জোর ছিল, বুকে সাহস ছিল, তাই পাড়া শাসন করে বেড়াতাম। লোকাল থানায় খোঁজ নেবেন স্যার, আমার তখনকার লাইফে কোনও খারাপ রেকর্ড নেই। কোনও চুরি, ছিনতাই, দু নম্বরি করিনি। কিন্তু বস্তির ছেলে তো, বুক ফুলিয়ে বেড়াতাম বলে ভদ্রলোকরা ভয় পেত। বলত, মস্তান।

মেয়েটার কথা বলো।

মিতালির কথা তো আপনিও জানেন স্যার। বড়লোকের মেয়ে, মাথাটা খাওয়াই ছিল। আমাকে লাইন দেওয়া শুরু করেছিল কবে থেকে, তখন ফ্রক পরত। চিঠি চালাচালি করত, ইশারা ইঙ্গিত করত। তারপর সিনেমায়- টিনেমায় নিয়ে গেছি। গরম মেয়ে স্যার। বলতে লাগল, আমাকে নিয়ে পালাও। তখন আমি সায়েন্স নিয়ে কলেজে পড়ছি। ভাল রেজাল্ট করতে হবে বলে খাটছি, অন্যদিকে আমার মাথা খাচ্ছে মিতালি। ওই বয়স তখন আমার, ফার্স্ট লাভ। সুন্দরী মেয়ে। বাপ বড়লোক। সব জেনেবুঝেও বয়সের

দোষে ঝুলে পড়লাম। পড়া গেল, ক্যারিয়ার গেল। লোকে বলে, আমি ওকে নষ্ট করেছি। লোকে দেখল না, ও আমাকে কতটা নষ্ট করেছিল। বড়লোকের তো দোষ হয় না। মিতালি ফিরে গেল, বাপের কাছে, ক্ষমা হয়ে গেল, পড়াশুনো করতে লাগল, বিয়ে হল, আমেরিকা গেল। এমনকি অত ভাল পাত্র মিঠু মিত্তিরকে ডিভোর্স করার মতো আস্পর্ধাও দেখাল। মিতালির কি কিছু লস হল স্যার? কিছু না। জীবনটা টালও খেল না, ক্যারিয়ার বিল্ড আপটা দেখুন স্যার। আর অন্য দিকে আমাকেও দেখুন। জীবনটা শুরু করেছিলাম কী দুর্দান্ত! গরিব ঘরের ছেলে, প্রাইভেট মাস্টার দূরের কথা বইপত্তরই জোগাড় হয় না। পুষ্টিকর খাবার নেই। পড়াশুনোর জায়গা জুটত না। তবু ওরকম রেজাল্ট। কত কী করতে পারতাম স্যার। বাপ-মা কত স্বপ্ন দেখত আমাকে নিয়ে। পুরো ধস নেমে গেল। মিতালির দোষ কেউ দেখল না, দেখলেও চোখ ফিরিয়ে নিল। আর আমাকে? প্রথম অপমান আর তাচ্ছিল্য করে গেল মিতালি। তারপর পুলিশ তুলে নিল। তারপর আপনি সব জানেন...

জানি।

আজ আমি পালাব কেন স্যার? পালিয়ে কোথায় যাব? আমার হারানোর কিছু নেই। জিজ্ঞেস করছিলেন মেয়েটাকে মারলাম কেন? আপনি বুদ্ধিমান, কেন মারলাম তা কি বোঝেননি? হাসপাতালে পুরো দু মাস থাকতে হয়েছিল। হাজতে চার মাস। পুলিশ কেস দিলে আরও কত দিন মেয়াদ হত কে জানে! বরুণ ঘোষ বেশি চাপাচাপি করেনি পাবলিসিটির ভয়ে। তাই ছেড়ে দিয়েছিল। ছাড়া পেয়ে কী হল স্যার? পাড়ায় সবাই দুয়ো দিত। পড়াশুনোর আর্জ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আগেই। তার ওপর শরীর। বাইরে থেকে ভিতরের ভাঙচুর দেখতে পাবেন না স্যার। বলছিলাম না, মিতালি মরল সেদিন, আমি মারা গেছি অনেক আগে। কিন্তু একটা হিসেব তো মেটাতে হবে। ডিভোর্সের পর একদিন মিঠু মিত্তির আমাকে পিটিয়েছিল, আগেই বলেছি স্যার।

বলিনি ?

বলেছ।

কিন্তু মিঠু মিত্তির টের পেয়েছিল সে একটা মরা মানুষকে পেটাচ্ছে। তাই মিঠু মিত্তির আমার সঙ্গে ভাব করে নেয়। শুধু তাই নয়, আমার সব কথা শুনে দয়া করে নিজের রিস্কে ট্যাক্সির লোন বের করে দেয়। নিজের পকেট থেকে টাকাও দিত সময়ে সময়ে। আমরা দোস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। মিঠু মিত্তিরকে কী করেছিল স্যার আপনাদের সুন্দরী বড়লোক মিতালি ? মিঠু মিত্তিরের দোষটা কী ছিল বলবেন ? তার জীবনটাও বরবাদ করে যায়নি কি ওই...যাক স্যার, আজ খারাপ কথা বলব না।

স্থির, অপলক, করুণ দু'খানা চোখে চেয়ে রইল শবর। কিছু বলল না।

হিসেবটা মেটানোর ছিল স্যার। আমার যে জীবনটা মিতালি কেড়ে নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য ছিল মিতালির ? ছিল না স্যার। আমি বহু বছর ধরে তার দেশে ফেরার জন্য ওত পেতে অপেক্ষা করেছি।

তুমি হয়তো জানো না, মিতালিও খুব হ্যাপি ছিল না।

মিতালি হ্যাপি ছিল কি না তা জেনে আমার কী হবে স্যার ? আমার একটা কিডনি নেই। আপনি জানেন না আমার সেক্স আর্জ চলে গেছে। পুরুষের পক্ষে কত যন্ত্রণার ব্যাপার বলুন, বিছানায় মেয়েমানুষ, সে কিছু করতে পারছে না। পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে পুরুষত্বহীনতায়। এই নষ্ট জীবন নিয়ে বেঁচে আছি কি মিতালিকে হ্যাপি দেখতে স্যার ? আমি তো মহাপুরুষ নই। আপনাকে রীতা দাসের কথা বলেছি। যদি কখনও তাকে পান, জিজ্ঞেস করবেন। সে আপনাকে বলবে কীভাবে সেক্সসুয়াল আর্জ-এর অভাবে আমি মাথা কুটেছি আর কেঁদেছি।

সে বলেছে।

বলেছে ? যাক বাঁচা গেল। আপনি তাহলে আমার জ্বালাটা একটু বুঝবেন। পার্টির দিন যখন ওরা ফুর্তি মারছিল

তখন আমি মরুভূমি বুকে নিয়ে দূর থেকে ওদের ঘরে আলোর রোশনাই দেখেছি। মাতালের হল্লা শুনেছি। আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম স্যার। সেই রাতে আমি মাতাল হইনি।

জানি। বলো।

রাত সাড়ে বারোটায় আমি দোতলায় উঠি। পিছন দিক দিয়ে। ঘরে ঢুকি। মিতালি তখন মাতাল। জামা কাপড় খোলার চেষ্টা করছে। দু'বার মেরেছিলাম। একটা আমার জন্য। আর একটা মিঠু মিত্তিরের জন্য।

শবর হঠাৎ ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, এবার পিস্তলটা আমাকে দাও পাণ্টু।

পাণ্টু একটু হাসল, সুইসাইড করব বলে ভয় পাচ্ছেন স্যার ? আরে না। এখন সুইসাইড করে লাভ কী বলুন। আপনারও বদনাম হবে। লোকে বলবে শবর দাশগুপ্ত নিজেই পাণ্টুকে মেরে সুইসাইড কেস সাজিয়েছে। মরে আর কী হবে ? মরা লোক কি দোবারা মরে স্যার ? তবে জজ সাহেবকে বলবেন, ওসব যাবজ্জীবনটিবন আমার ভাল লাগে না। ফালতু চৌদ্দ বছর শুয়ে বসে থাকা। তার চেয়ে ঝটপট ট্রায়ালটা মিটিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন যেন। বলবেন স্যার ?

শবর একটু হাসল।

অ্যারেস্ট করবেন না স্যার ?

শবর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পালাতে পারতে। কেন যে পালালে না !

বললাম তো স্যার, কোথায় পালাব ? কার কাছ থেকে পালাব ? আমার ফিলজফিটা আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার ?

পারছি। পাণ্টু অধিকারী, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

* * *

এটাই কি সেই দীর্ঘ চুমু ?

না। এটা অন্য। আর একরকম। অনেক বিষণ্ণ, অনেক

গভীর।

জানি। আজ তো তুমি আর সেই তুমি নও। আজ তুমি অনেক বিষণ্ণ, কত গম্ভীর! •

আজ আমি অনেক গভীরও। তাই না?

আমরা কি সুখী হব, বলো না!

কে জানে! কেউ তা বলতে পারে না।

আমরা কোনওদিন তেমন সুখী হতে পারব না বোধ হয়! হ্যাঁ গো, একটা কথা বললে তুমি কি রাগ করবে?

রাগ! ফুলশয্যার রাতে? তাও কি হয়?

শোনো, আমরা কেন সব ওদের দিয়ে দিই না?

মিঠু নিবিড়ভাবে, জয়িতার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মুখে মিটি মিটি হাসি। মৃদু স্বরে বলল, কাকে দেবে? কী দেবে?

দোয়েল তো আসলে জ্যাঠামশাইয়ের বউই, বলো। প্রীতীশ তো ছেলে। হ্যাঁ গো, কেন ওদেরই সব দিয়ে দিই না আমরা?

জানতাম।

কী জানতে?

তুমি যে এই কথা বলবে।

তুমি বুঝি অন্তর্যামী?

হ্যাঁ। ভালবাসলে মনের কথা টের পাওয়া যায়, জানো না?

আমিও তোমার মনের কথা টের পাই।

কীরকম?

তুমিও চাও। তাই না? তুমিও চাও ওরা সব নিয়ে নিক।

চাই। কিন্তু আস্তে আস্তে। একবারে অত সম্পত্তি হাতে পেলে ওরা দিশাহারা হয়ে যাবে। লোকে ওদের এক্সপ্লয়েট করবে। ছেলেটা আদরে নষ্ট হবে। ধীরে, বন্ধু ধীরে।

আমি বোকা নই তো!

না। তুমি খুব ভাল।

তুমিও। আমরা কি সুখী হব? বলো না।